জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৪৪তম সংখ্যা

কালের অভিযাত্রী
তোয়াব খান

নিরীক্ষা

২৪৪তম সংখ্যা: জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

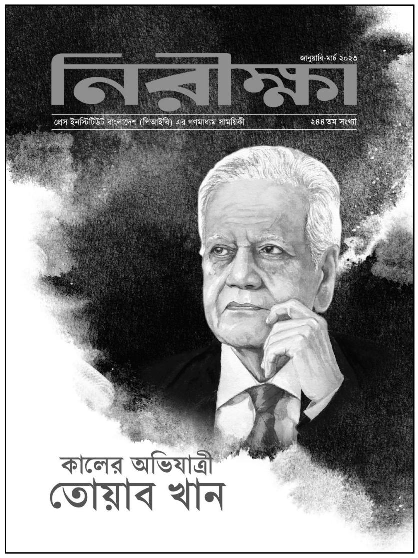

যেখানেই রেখেছেন হাত, স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে অনন্তর। সত্যের বিপরীতে নয়, সত্যের পক্ষেই ছিল যাঁর অবস্থান আজীবন। সত্য উদ্‌ঘাটন, সত্যের বিকাশ এবং সত্যপ্রকাশই ছিল যাঁর জীবনের ব্রত। অজস্র বাধাবিপত্তিকে দুহাতে সরিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন বিজয়ের মনোরথে। 'সত্য-মিথ্যা-মিথ্যা-সত্য' শিরোনামে 'সত্যবাক' ছদ্মনামে নিয়মিত কলামও লিখেছেন। নীতি-নৈতিকতাকে সামনে এনে অনড় অবস্থানে ছিলেন আমৃত্যু। বলা হয়, তিনি সাধারণ থেকে হয়ে উঠেছিলেন অসাধারণ। সাত দশকের বেশি সাংবাদিকতায় তিনি রেখেছেন অনন্য অবদান। খ্যাতিমান গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বে উন্নীত হয়েছিলেন। প্রতিমুহূর্তে নিজেকে অতিক্রম করেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন কর্মচঞ্চল। কোনো কিছুই তাঁকে কাবু করতে পারেনি। জীবনের পথে-প্রান্তরে শুধু নুড়ি কুড়ানো নয়, কুড়িয়েছেন শিল্পিত ইমেজ। দেশবিভাগের শিকারও তিনি। পরিবারের মধ্যেই ছিল সাংবাদিকতার চর্চা। সেই চর্চাকে তিনি মর্যাদায় আসীন করেছেন। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার জগতে তিনি স্মরণীয়-বরণীয় পরম শ্রদ্ধায়। একাত্তরের কলমযোদ্ধা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক তোয়াব খান। সাহসের বরাভয় কাঁধে তিনি হেঁটেছেন দীর্ঘপথ। তাঁর নাম আজ কেবলই নাম নয়, সাংবাদিকতায় তিনি প্রতিষ্ঠিত আজ একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁকে শানিত করেছে জীবনযুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামে কর্তব্যের ধারায়, কর্মকুশলতা, নিষ্ঠা ও সাহসের পরাকাষ্ঠায়। কোনো হীনম্মন্যতা তাঁকে করতে পারেনি স্পর্শ।

তোয়াব খানের সাংবাদিক জীবনের সূচনা ঢাকায় পঞ্চাশের দশকে তরুণ সাংবাদিকতার অগ্রদূত হয়ে। দৈনিক সংবাদ ছিল তাঁর পেশাদারত্বের প্রথম কর্মক্ষেত্র। পরে দৈনিক পাকিস্তান। দেশ স্বাধীনের পর দৈনিক পাকিস্তান থেকে বদলে যাওয়া দৈনিক বাংলার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব ছিলেন। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন তিনি। ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শব্দসৈনিকের ভূমিকা পালন করেন। সেসময় তাঁর উপস্থাপনায় নিয়মিত প্রচারিত হয় 'পিন্ডির প্রলাপ'। দৈনিক জনকণ্ঠের শুরু থেকে ২০২১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পত্রিকাটির উপদেষ্টা সম্পাদক ছিলেন তোয়াব খান। জীবনের শেষভাগে নতুন আঙ্গিক ও ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত দৈনিক বাংলার সম্পাদকের দায়িত্ব নেন।

সাংবাদিকতার সব বিভাগেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। মননে মুক্তচিন্তার অধিকারী। পেশার মর্যাদা ও বিবেকের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য তোয়াব খান জেল-জুলুমও সহ্য করেছেন। মৌলবাদীদের হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন। মৌলবাদীদের সমর্থক সরকারের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। কিন্তু পিছু হটেননি, নত করেননি মাথা।

অগ্রসর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাংবাদিকতাকে ব্রত হিসাবে নিয়েছেন। পেশাগত জীবনে সাত দশকে বহুদর্শী মানুষটি নামের পেছনে কখনো ছোটেননি। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে একেকটি মাইলফলক রচিত হয়েছে তাঁরই নেতৃত্বে। প্রথম চাররঙা সংবাদপত্র এর মধ্যে একটি। সব সময় পাঠকই তাঁর 'প্রাইমারি কনসার্ন'। সংবাদপত্রে পুরো পাতা ফ্যাশন আর টেকনোলজির জন্য বরাদ্দের কথা তাঁর আগে আর কেউ ভাবেননি। তিনি দৈনিক জনকণ্ঠে সেটাই করেছেন। পাঠককে দিয়েছেন নতুন স্বাদ, সময়ের দাবি মেনে। সাংবাদিকদের সম্পর্কে পুরোনো ধ্যানধারণাও তিনি বদলে দিয়েছেন। প্রত্যেক সহকর্মীর কাছ থেকে সেরা কাজটুকু আদায় করে নেওয়ার বিরল ক্ষমতা ছিল তাঁর। এই ক্ষমতাই রচনা করেছে তাঁর সাফল্যের ভিত। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান বলতে যা বোঝায়, এর শেষ সলতে ছিলেন তোয়াব খান। তিনি ছিলেন সাংবাদিকতায় শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার ঠিকানা।

নিরীক্ষার এ সংখ্যা বিশিষ্টজনদের লেখায় সমৃদ্ধ করা হয়েছে। যাঁরা প্রত্যেকেই তোয়াব খানের সহকর্মী বা কাছের মানুষ। তাদের স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে একজন অনন্য তোয়াব খান, যিনি বিস্মৃত হবেন না কখনো। তোয়াব খানের প্রতি অতলশ্রদ্ধা।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূচিপত্র

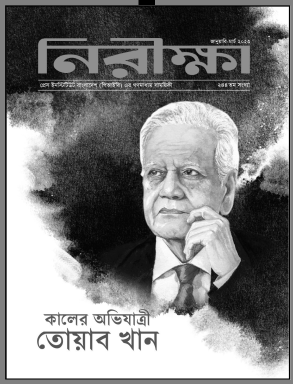

তোয়াব ভাইকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে গেলাম ৩
মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

সাংবাদিকতার পথিকৃৎ তোয়াব ভাই ৫
সাখাওয়াত আলী খান

একজন কমপ্লিট সাংবাদিক তোয়াব খান ৭
আবেদ খান

আমারে যেন না করি প্রচার ১০
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

অনন্য তোয়াব খান ১২
মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

পাঠকের চাহিদা বুঝে সাংবাদিকতা করেছেন তোয়াব খান ১৪
খায়রুল আনোয়ার

তোয়াব খান—নিরন্তর অনুপ্রেরণা ১৬
তারিক আনাম খান

তোয়াব খান সংবাদ সারথির প্রয়াণ ১৮
সাইফুল আলম

একটি সংবাদেই সবকিছু স্মৃতি ২০
ওবায়দুল কবির

তোয়াব খান: দীক্ষাগুরুর স্মরণ শরণ ২২
হাসান হাফিজ

তোয়াব খান: পাঠক ছিল যাঁর প্রাইমারি কনসার্ন ২৫
আলী হাবিব

২৮ যাকে ভয় পেতাম, শ্রদ্ধাও করতাম
শরিফুজ্জামান পিন্টু

৩০ আমরা অভিভাবকশূন্য হয়ে গেলাম
মোবাশ্বেরা খানম বুশরা

৩২ তোয়াব খান কঠিনে কোমল
শমশের সৈয়দ

৩৪ 'এই আলীম তোমার জেলায় কি যুদ্ধ হয়নি? রাজাকার নেই?'
মীর আব্দুল আলীম

৩৬ সত্তর সালেই 'দৈনিক পাকিস্তান' কার্যত 'দৈনিক বাংলাদেশ' হয়ে যায়—তোয়াব খান
রাহাত মিনহাজ

৪১ সত্য উদ্‌ঘাটন সত্যের বিকাশ এবং সত্যের প্রকাশ
তোয়াব খান

৪৫ নির্বাচিত 'পিন্ডির প্রলাপ'

৪৮ দ্রোণাচার্যের জন্য ভালোবাসা
আকিল জামান ইনু

৫১ কালের অভিযাত্রী
দুলাল আচার্য

৫৩ সম্পাদকের বৈঠকে
জাফর ওয়াজেদ

৫৭ গণমাধ্যম সংবাদ

৬৭ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ৪০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

প্রবন্ধ

তোয়াব ভাইকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে গেলাম

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

আমার অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন তোয়াব খান এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বহুদূরে চলে গেলেন। এই দেশের জন্য, সাংবাদিকতা পেশার জন্য, মুক্তবুদ্ধি ও সংস্কৃতির জন্য এবং প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডলে এই অসাধারণ মানুষটির অভাব খুব সহজে পূরণ হওয়ার নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে একজন বড়ো ভাই, পরম সুহৃৎ ও বন্ধু হারানোর শূন্যতা নিয়ে বাকি জীবন কাটাতে হবে।

তোয়াব খান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি–এই উভয় শাসন আমলেই শক্তিমান প্রেস সচিব হিসাবে কাজ করেছেন। জাতির পিতার ৩ বছর ৭ মাস শাসনকালে তোয়াব খানই সবচেয়ে দীর্ঘসময় সফলভাবে এই গুরুদায়িত্বটি পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর জোটনিরপেক্ষ নীতি, বাংলাদেশি ধাঁচের সমাজতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদের পরিমণ্ডলে তোয়াব খান শুধু প্রেস সচিব নন, একজন বিজ্ঞ উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করেছেন। সাংবাদিকতা পেশার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা যথা: আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, এনায়েতুল্লাহ্ খান, গোলাম রসুল মল্লিক, শহীদুল হক, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ভিন্ন ভিন্ন পথ ও মতের অনুসারী হলেও জাতির পিতার সরকারের কর্মকাণ্ড বুঝতেন এবং এর

যথার্থতাও উপলব্ধি করতেন। এক্ষেত্রে প্রেস সচিব তোয়াব খানের অবদান অনস্বীকার্য।

কোনো একটি বড়ো ঘটনা সংঘটিত হলে একে ধামাচাপা না দিয়ে জনসম্মুখে আনা অথবা সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবিধান করা তোয়াব ভাইয়ের পেশাদারির একটা বড়ো বিশেষত্ব ছিল। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক হত্যাকাণ্ডের আগের দিন নানা গুজবের ডালপালার মাঝে নোয়াখালীতে একটি ভারতীয় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়। এতে একজন নিহত হন। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব তোয়াব খান এ ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন।

একবার বিদেশ সফরকালে মিডিয়া টিমের একজন সদস্য চরম অসদাচরণ করে ফেললে ওই সমাজতান্ত্রিক দেশের কর্তৃপক্ষ কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই তোয়াব ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে তাঁকে বরখাস্ত করে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি।

দীর্ঘ পেশাজীবনে তোয়াব খানের রয়েছে বড়ো বড়ো অর্জন। তাঁর একটি অসমাপ্ত কাজ: আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, তোয়াব খান, মাহবুব তালুকদার, শামসুজ্জামান খান প্রমুখের যৌথ প্রচেষ্টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনকথার যে খসড়াটি আমার জানামতে প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, এটিকে আর কোনোভাবেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

আমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন তোয়াব ভাইকে অন্তরের গভীরতম স্থান থেকে অসীম শ্রদ্ধা জানাই এবং এই অসাধারণ দেশপ্রেমিকের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

[তোয়াব খান যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব, তখন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব ছিলেন]

লেখক: অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

পিআইবি'র প্রকাশনা

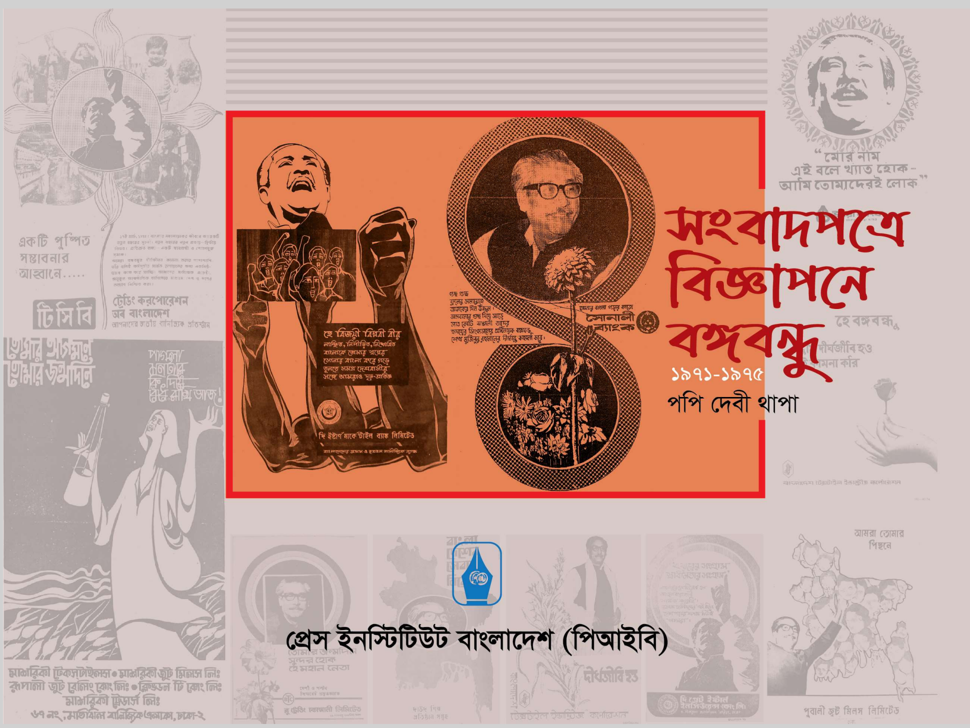

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

সাংবাদিকতার পথিকৃৎ তোয়াব ভাই

সাখাওয়াত আলী খান

তোয়াব ভাইয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। আমি ১৯৭২ সাল পর্যন্ত দৈনিক বাংলায় সিনিয়র সাব-এডিটর এবং শিফট ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করি। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় ১৯৬৫ সালের ৫ জানুয়ারি 'দৈনিক পাকিস্তানে' যোগদান করার পর। এর আগে আমার সঙ্গে স্বল্পমাত্রার পরিচয় ছিল। সেই সময় থেকে সাত বছর আমি তোয়াব ভাইয়ের সহকর্মী হিসাবে কাজ করেছি। তিনি দৈনিক পাকিস্তানে প্রথমে মুখ্য সহ-সম্পাদক এবং পরে বার্তা-সম্পাদক হন।

১৯৬২ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হই। ১৯৬৩ সালে আমিই প্রথম এই ডিগ্রিটি অর্জন করি। তখন দৈনিক পাকিস্তান রাষ্ট্রপক্ষের দৈনিক হওয়ায় উচ্চবেতন দেওয়া হতো। আমি এই দৈনিকটিতে যোগদান করার পর তোয়াব ভাই আমাকে আন্তর্জাতিক পাতার দায়িত্ব দেন। পরে সেন্ট্রাল ডেস্কে লোকবলস্বল্পতা তৈরি হলে আমি সেই বিভাগে কাজ শুরু করি এবং পরে শিফট ইনচার্জের দায়িত্ব পাই। আমার ঊর্ধ্বতন হিসাবে তখন ফয়জুল করিম তারা ভাই, আবদুল খালেক খান এবং নির্মল সেনের মতো সাংবাদিকরা সেখানে কাজ করতেন। তোয়াব ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করার সুবাদে একটি অম্ল-মধুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়। অনেক সময় তাঁর মতের সঙ্গে মিল না হলে তর্কে লিপ্ত হতাম। তারপর আলাপ-

আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতাম। তখন তোয়াব ভাই, নির্মলদা এবং আমি মিলে বৈঠক করে দৈনিকটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতাম। কাজ করার একপর্যায়ে শুরু হলো মহান মুক্তিযুদ্ধ।

দৈনিক পাকিস্তান ছিল সরকারি পত্রিকা। পাকিস্তান ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে এটি প্রকাশিত হতো। সেসময় দৈনিকটিতে আইয়ুব খান আর মোনেম খানের সংবাদকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হতো। সরকারপক্ষের দৈনিক হয়েও এটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল সংবাদ পরিবেশনের জন্য। আর এটির নেপথ্যে ছিলেন তোয়াব ভাই। তাঁর নিউজ ট্রিটমেন্ট দেওয়ার ব্যাপারে মুনশিয়ানা ছিল। সেজন্য তিনি রাষ্ট্রপক্ষের পত্রিকায় কাজ করেও সাংবাদিক হিসাবে সেসময় প্রভূত খ্যাতি আর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। আর তোয়াব ভাইয়ের আরেকটি বিশেষত্ব ছিল–ফিচার। তিনি সরকারি পত্রিকাকে ফিচার দিয়ে সাজিয়ে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তিনিই প্রথম সেসময় এখানকার দৈনিকে ফিচারের ভাবনাটা নিয়ে আসেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনন্য।

মুক্তিযুদ্ধের পর আগের দৈনিক পাকিস্তানে কাজ করা ফওজুল করিম তারা ভাই, আমিনুল ইসলাম এবং আমি সাখাওয়াত আলী খান–এই তিনজন যুদ্ধফেরত সাংবাদিক সেই দৈনিকটির নাম কেটে দিয়ে 'দৈনিক বাংলাদেশ' নামে পত্রিকা তিন দিন ধরে প্রকাশ করেছিলাম। সেই সময় তোয়াব ভাই কলকাতা থেকে দেশে ফিরে আসেননি। এ সময় ফওজুল করিম তারা ভাই 'দৈনিক বাংলাদেশ' প্রকাশে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তোয়াব ভাইয়ের খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন তিনি। পরে তোয়াব ভাই ও তারা ভাই 'দৈনিক বাংলা' প্রকাশেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তোয়াব ভাই তো ছিলেন দৈনিক বাংলার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। আসলে দৈনিক বাংলার সংবাদ অংশের প্রাণ ছিলেন তোয়াব ভাই ও তারা ভাই।

সেসময় আমার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের দিন পত্রিকার পুরো দায়িত্ব পড়ল। সেই ঘটনাটি ছিল সদ্য যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের। এটি বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের একটি বড়ো সাফল্য ছিল। সেদিন তোয়াব ভাই ব্যক্তিগত কারণে অফিসে আসতে পারেননি। গুরুত্বপূর্ণ এই দিনে তিনি আমার ওপর দৈনিক বাংলায় সংবাদ পরিবেশনের পুরো দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এরপর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করলেও তাঁর জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত সম্পর্কটা অটুট ছিল। তিনি দৈনিক পরিচালনার বিষয়ে কঠোর ও সময়ানুবর্তী হলেও ব্যক্তিজীবনে খুবই অমায়িক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বহু বিষয়ে মতের অমিল হয়েছে, তর্ক হয়েছে; কিন্তু সম্পর্কে সেটার প্রভাব পড়েনি। কখনো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে কার্পণ্যবোধ করেননি।

তিনি যখন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন, তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই। সেসময় তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথতার ভিত্তিতে কিছু কর্মকাণ্ড করতে চাইলে তিনি শুধু সম্মত হননি, বিষয়টিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তিনি কখনোই বিতর্ক করাকে নেতিবাচকভাবে দেখতেন না, এ বিষয়টিকে উৎসাহ দিতেন।

তোয়াব ভাইয়ের মতো সম্পাদকের এ দেশের সাংবাদিকতা ইতিহাসে জুড়ি মেলা ভার। বিশেষ করে নিউজ ট্রিটমেন্ট এবং প্রেজেন্টেশনে তাঁর মতো দক্ষতা আমি এখানে খুব একটা দেখিনি। তিনি যেভাবে একটি সংবাদকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে বিশ্লেষণ করে গুরুত্ব তৈরি করতে পারতেন, এরকম দক্ষতা আমার মতে এ দেশে খুব বিরল। এদিক দিয়ে তিনি সাংবাদিকতার ইতিহাসে অনন্য হয়ে থাকবেন।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারনিউমারারি প্রফেসর

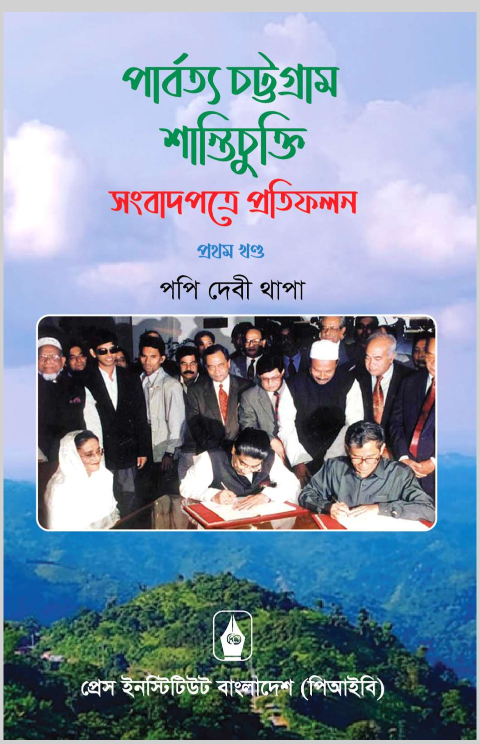

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

একজন কমপ্লিট সাংবাদিক তোয়াব খান

আবেদ খান

তোয়াব ভাই সাংবাদিকমহল এবং সাংবাদিক পরিমণ্ডলে একজন কিংবদন্তি হিসাবেই আদৃত। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে যখন এ পেশায় পা রাখেন, তখন থেকেই তিনি নিজেকে নিবেদন করেছেন পেশাটির পাদমূলে। আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ থেকে একবিন্দু বিচ্যুত হননি। একজন কমপ্লিট সাংবাদিক বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন তাই। এ কথা শুধু আমি নই, এ পেশার সঙ্গে যুক্ত যাঁরা তাঁর সাহচর্যে এসেছেন, প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করেন।

তাঁর ব্যাপারে লেখার কথা বললে আমি বিব্রত হই। যখন আমাকে দুলাল আচার্য টেলিফোন করল, তখন আমি বারবার ভাবছিলাম কীভাবে শুরু করব। এই বিব্রত হওয়ার পেছনে যথেষ্ট কারণও আছে। সবাই জানেন, আমরা একই পরিবারের সদস্য। আমার শৈশব থেকেই তো তাঁকে দেখেছি। এই দেখা একটু অন্যরকম এক দেখা। আমাদের পরিবারের একটা রেওয়াজ আছে–আছে না বলে ‘ছিল’ বলাই ভালো। কারণ, আজ আর সেই রেওয়াজটি চলমান নেই বললেই চলে। পরিবারের মানুষগুলো যেভাবে বদলে গেছে, হয়তো এই বদলের চাকায় সেই পুরোনো মূল্যবোধও ক্ষয়ে গেছে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তোয়াব ভাইকে আমি তিন রকমে চিনি। এক. পারিবারিকভাবে। দুই. সাংবাদিকতার নিরিখে। তিন. মানুষ হিসাবে। পারিবারিকভাবে

> তোয়াব খান শুধু নিজে সাংবাদিক ছিলেন না, ছিলেন সাংবাদিকদের কারিকর। তাঁর যে নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতা ছিল, এখন আমরা আর তা খুঁজে পাব না। তোয়াব খান যেখানেই কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন, সেখানে তাঁর একটি ছাপ রেখে গেছেন

আমার সম্বোধন মামাও হতে পারত। দুলাভাই তো বলতেই পারি। আর ভাই তো বলিই। মামা বলতে পারি মাতৃকুলের আত্মীয়তার সূত্রে। এই ত্রিমুখী সমীকরণের কারণও রয়েছে। আমাদের পিরালিগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ছিল আমাদের বিবাহ হতো নিজেদের মধ্যেই। এটা চলে আসছিল প্রায় দুই শতাব্দীর অধিককাল ধরে। এগুলো বিভিন্ন সময়ে আলোচিত কিংবা লিখিতও হয়েছে। আপাতত এখানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক।

আমার মাতৃকুলের বিস্তার পশ্চিমবঙ্গে সীমান্তবর্তী হাকিমপুরে। একেবারে সোনাই নদীর পাড়ে। অবিভক্ত আমলে তো সবই ছিল একত্রে। খুলনার রসুলপুর, পলাশপুর, সুলতানপুর, কাটিয়া থেকে ওপারের হাকিমপুর, লবঙ্গ, বসিরহাট, কলকাতা–সবই ছিল এক অবিভাজ্য ভূখণ্ড। আমাদের পিরালীগোষ্ঠীর বিস্তার এখানেই। তোয়াব ভাইয়ের বাবা ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন। সাদা ঘোড়ার পিঠে উঠে ওই অঞ্চলে রোগী দেখতেন। আমার মায়ের বর্ণনা অনুযায়ী, দুধে আলতা রঙের এক সাহেব মাথায় হ্যাট দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রোগী দেখে বেড়াচ্ছেন। তাঁর রোগীরা ছিল সব দরিদ্র। সাতক্ষীরা থেকে বসিরহাট তাঁর প্রচুর সুনাম। তাঁর সমাজকর্ম সর্বজনবিদিত। সরাসরি জানি না, তবে জেনেছি। তাঁর সংযোগ ছিল বাম রাজনীতির সঙ্গে। বিশেষ করে তাঁর ভাই কমরেড আব্দুর রাজ্জাক খান ছিলেন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তাঁর প্রভাব সুদূর কলকাতা থেকে আমাদের সাতক্ষীরার প্রত্যন্ত অঞ্চল তো বটেই, সব জায়গায় বিস্তৃত ছিল। তৎকালীন বাম রাজনীতির যে গতিধারা ছিল, তা এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই। এর একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে, ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই সময়ে সীমান্তের ওপারে ৮ নম্বরের যে সাব-সেক্টরটি হয়েছিল, সেটা ওই হাকিমপুরেই। সেই সময় এই অঞ্চলজুড়ে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের এক বিশাল চারণক্ষেত্র। এই পরিবেশের ভেতর থেকেই তোয়াব খানের বেড়ে ওঠা।

তোয়াব খান যখন তাঁর পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সান্নিধ্য পেয়েছিলেন কমরেড মণি সিংহ, খোকা রায়, নেপাল নাগ, বারীন দত্ত, রণেশ দাশগুপ্ত, শহীদুল্লা কায়সার, আলতাফ আলীর মতো নেতা ও সাংবাদিকের। কাজেই সমগ্র আবহটা ছিল একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারার। আর এ আবহের প্রভাব ছিল তোয়াব খানসহ তাঁর পরিবারের সবার ওপরই। পঞ্চাশের দশকে সাতক্ষীরা থেকে ঢাকায় এসে তিনি যখন সাংবাদিকতা পেশায় পা রাখেন, আমার তখন শৈশব। আমার মনে আছে, তাঁকে যখন আমি দেখি, তখন ভয়ে তাঁর কাছেই যেতাম না। কিন্তু তাঁর ছিল এক অদ্ভুত আকর্ষণীয় ক্ষমতা। অত্যন্ত সুপুরুষ, মার্জিত এবং স্বল্পভাষী একজন মানুষ। সেভাবেই আমি তাঁকে দেখেছি ছোটোবেলায়। এই হচ্ছে তাঁর সঙ্গে আমার পারিবারিক যোগসূত্র।

১৯৬৩ সালে আমি দৈনিক সংবাদে যখন কিছুকালের জন্য কাজ শুরু করি, তখন আমি তোয়াব খানের সান্নিধ্যে আসি। তবে সেটা ছিল অতি স্বল্প সময়ের জন্য। তিনি তখন দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। সেখান থেকে আমি দৈনিক ইত্তেফাকে যোগ দিলাম। তারপর পেশাগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার সেই সংযোগটি সেভাবে আর তৈরি হয়নি। পরবর্তী সময়ে তিনি যখন তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানে বার্তা সম্পাদক পদে যোগ দিলেন, সেখানে তাঁর অবস্থানটি আরও বেশি সরব হয়ে উঠল। কারণ, তাঁর বৈশিষ্ট্যই ছিল নতুনভাবে পত্রিকাকে সাজানোর একটা আন্তরিক প্রয়াস। এ ব্যাপারে অসাধারণ তাঁর কর্মচিন্তা ও বাস্তবায়ন কৌশলের প্রশংসা সবাই করেন। সেই কাজটিই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করতে শুরু করলেন পত্রিকাটিতে। সেসময় তাঁর সম্পর্কে একটি কথা বলা হতো যে, তিনি সময়ের শ্রেষ্ঠ বার্তা সম্পাদক। তোয়াব খান যখন দৈনিক পাকিস্তানে কাজ করেন, পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। সরকারি পত্রিকা অর্থাৎ প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকাটি তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি পত্রিকাটিকে সেসময় অত্যন্ত আধুনিক করে তুলেছিলেন। বিশেষ করে সত্তরের ভয়ানক প্রাণঘাতী জলোচ্ছ্বাসের সময় পত্রিকাটি অসাধারণ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছিল। তখন দৈনিক পাকিস্তানের প্রচার সংখ্যা হুহু করে বেড়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তৎকালীন দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাককেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এটাই হচ্ছে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। তারপর তোয়াব খান পেশাগত জীবনে নানা সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বড়ো বড়ো দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রতিটি জায়গায় দেখিয়েছেন নিজের স্বতন্ত্র মুনশিয়ানা।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি প্রেস ট্রাস্টের একজন হয়েও অতি গোপনে দেশ ত্যাগ করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তারপর তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিজের দায়িত্বটি পালন করেন। তিনি যখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে, ঠিক একই সময় আমি আকাশবাণী বেতার কেন্দ্র, কলকাতায়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তাঁর লেখা ও উপস্থাপনায় সেখান থেকে নিয়মিত প্রচারিত হতো 'পিন্ডির প্রলাপ'। আর আকাশবাণীতে তখন আমার লেখা ও উপস্থাপনায় নিয়মিতভাবে প্রচারিত হয় 'জবাব দাও'।

তোয়াব খান কখনোই তাঁর সাংবাদিকতা পেশার ব্যাপারে আপস করেননি। তিনি তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য এমনকি জেলও খেটেছেন। তিনি যখন দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক হন, তাঁকে রীতিমতো কারাগারে পাঠানো হয়। কেবল এ পেশাকে সম্মান জানিয়ে তিনি জীবনে বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সাংবাদিকতা জীবনে আমাদের নানা রকমের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে; কিন্তু একজন তোয়াব খানকে কখনোই এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি। সারা জীবন তাঁকে নিয়ে কখনো কোনো বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি এবং অজাতশত্রু হিসাবে পেশাগত জীবনে নিজের অবস্থানকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এমনকি তিনি যখন বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, আবার সেই তিনিই দায়িত্ব পালন করেছেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদেরও প্রেস সচিব হিসাবে। কিন্তু তাঁর চারপাশে সর্বদাই তিনি একটি লক্ষণরেখা তৈরি করে রেখেছিলেন, যেটাকে তিনি কখনোই অতিক্রম করেননি কিংবা কোনোভাবেই তিনি তাঁর নৈতিক অবস্থানটাকে নত হতে দেননি। সে কারণেই তিনি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাংবাদিক। তোয়াব ভাই ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, মেধাবী ও কর্মঠ মানুষ; নীতির প্রশ্নে অবিচল, নিয়মরক্ষায় অত্যন্ত যত্নবান। একই সঙ্গে উদ্ভাবনী ক্ষমতায় অনন্য শক্তিমান ছিলেন তিনি। সেভাবেই আজীবন আমি তাঁকে দেখেছি।

আমি দৈনিক ইত্তেফাক থেকে পদত্যাগ করার পর যখন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও কলামিস্ট হিসাবে দেশবিদেশে লিখে চলেছি, সেই সময়গুলোয় তাঁর যে সহযোগিতা আমি পেয়েছি, তা ছিল আমার জন্য বিরাট প্রাপ্তি। তিনি তাঁর পত্রিকা দৈনিক জনকণ্ঠের প্রথম পৃষ্ঠায় আমাকে লেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সেসময় দৈনিক জনকণ্ঠে সম্পাদকীয় পাতায় 'অভাজনের নিবেদন', 'গৌড়ানন্দ কবি ভনে শুনে পুণ্যবান', বিশেষ করে প্রথম পাতায় 'লেট দেয়ার বি লাইট'–এ সবকিছু লেখার পেছনে এই তোয়াব খানের ভূমিকা ছিল অনবদ্য। তিনি তাঁর পত্রিকায় এসব কলাম এমনভাবে উপস্থাপন করতেন, যাতে খুব সহজেই পাঠকচিত্ত দারুণভাবে আকৃষ্ট হতো। কাজেই কেবল আমিই নই, সেসময় জনকণ্ঠে যারা কাজ করেছেন, তাঁদের অনেকেই এখনো করছেন, পরবর্তী সময়ে পেশাগত কারণে নানা জায়গায় চলে গেছেন, সাংবাদিক হিসাবে বিরাট নামডাক হয়েছে–এমন বহু সাংবাদিককে তিনি নিজ হাতে তৈরি করেছেন। তাঁরা সবাই সেই অবদান স্বীকার করেন। তোয়াব খান শুধু নিজে সাংবাদিক ছিলেন না, ছিলেন সাংবাদিকদের কারিকর। তাঁর যে নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতা ছিল, এখন আমরা আর তা খুঁজে পাব না। তোয়াব খান যেখানেই কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন, সেখানে তাঁর একটি ছাপ রেখে গেছেন। সেকারণে সবাই সর্বদাই তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। একইভাবে তিনি সাংবাদিকতা কিংবা মানুষ হিসাবে যে আদর্শ ও পথের ছাপ রেখে গেছেন, সেই আদর্শ ও পথকে ধারণ ও বহন করার যোগ্যতা বোধহয় আমরা যাঁরা তাঁর উত্তর প্রজন্ম, তাঁদের অনেকেরই নেই।

আজ এভাবেই বলতে চাই, তোয়াব খানকে স্মরণ করে লেখা মানে নিজেকে গৌরবান্বিত করা। তাঁর স্নেহে লালিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ফলে প্রতিমুহূর্তে তাঁকে আমি মিস করি। খুব মিস করি। ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময় ও পরিস্থিতিতে কেবল তিনিই ছিলেন, যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি সর্বদা অমূল্য পরামর্শ, পেয়েছি নিরাপদ আশ্রয়। সেই পরামর্শ আজ আর আমি কারও থেকে পাব না। কারণ, তোয়াব ভাই যে আর নেই! তোয়াব ভাই ছিলেন আমাদের সঙ্গে, তোয়াব ভাই থাকবেন। আমরা যদি হারিয়েও যাই, তোয়াব ভাইয়েরা কখনোই হারাবেন না।

লেখক: প্রধান সম্পাদক, দৈনিক কালবেলা এবং প্রকাশক ও সম্পাদক, দৈনিক জাগরণ

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

আমারে যেন না করি প্রচার

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

তোয়াব খানের মৃত্যুতে এ দেশের সাংবাদিকতাজগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। জীবদ্দশায় নিজেকে কিংবদন্তির জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন আমাদের প্রিয় তোয়াব ভাই। প্রায় ৭০ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে তিনি ছিলেন নানা স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল।

সদ্যপ্রয়াত তোয়াব খানের চেহারাটা মনে এলেই আমার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৩১৩ বঙ্গাব্দে রচিত 'আমার মাথা নত করে দাও হে প্রভু' কবিতার 'আমারে যেন না করি প্রচার' পঙ্‌ক্তিটি বারবার স্মরণে আসছে। বাংলা সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ মওলানা আকরম খাঁর পরিবারে জন্ম নেওয়া তোয়াব ভাই ১৯৫৩ সালে সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত হন। এরপর থেকে তিনি বহু সংবাদমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে তাঁর উপস্থাপিত 'পিন্ডির প্রলাপ' জনমানসে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীনতার বীজমন্ত্রে সঞ্জীবিত তোয়াব খান তাই মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন আগে নবোদ্যোগে প্রকাশিত 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের সময় শর্ত দিয়েছিলেন, দৈনিকটিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার হতে হবে।

এর আগে ১৯৯৩ সালে দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক হিসাবে তাঁর ভূমিকা আমাদের মনে আছে। সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ আর জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ়তা সেসময় দৈনিকটির পাতায় পাতায় প্রতিফলিত হতো। প্রায় ৮৮ বছর বয়সেও তিনি মানসিক এবং শারীরিক স্থিতাবস্থা বজায় রেখে একটি নতুন দৈনিক পরিচালনার কঠিন কাজে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন, সেই কাহিনিটি ইতোমধ্যে তাঁর সেখানকার

> সত্য প্রকাশ এবং সততাই যে একজন সাংবাদিকের মূল কর্তব্য, সেটাই তোয়াব ভাই সারা জীবন পালন করে গেছেন। আর তাঁর সাহচর্যে যারাই এসেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি সুচারুভাবে এই মন্ত্রটিই বপন করে দিতে চেয়েছেন

সহকর্মীদের গণমাধ্যমে প্রকাশিত লেখা বা সংবাদ থেকে জানা যায়। তবে তাঁর এই অসাধারণ কর্মনৈপুণ্য অনেক আগে থেকেই সুবিদিত। স্বাধীনতার উষালগ্নে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দৈনিক পাকিস্তান থেকে দৈনিক বাংলায় রূপান্তরের ঐতিহাসিক মুহূর্তে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আবার তাই যখন নতুন আঙ্গিকে দৈনিক বাংলা প্রকাশিত হলো, তখন তিনি সেই দৈনিকটিরও সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব পালন করতে পিছপা হননি। সাংবাদিকতাজগতে এ রকম নানা কৃতিত্বই তাঁকে এখানকার সংবাদমাধ্যমের একজন মহিরুহে পরিণত করেছিল। কিন্তু এতকিছু তিনি নীরবে-নিভৃতেই করতে চেয়েছেন। নিজেকে কখনো পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসতে চাইতেন না।

তোয়াব ভাই সম্পাদকের টেবিলে বসে সংবাদের মূল্যায়ন করেছেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য সহকর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া থেকে শুরু করে সহায়তা করেছেন এবং সম্পাদকীয় নীতি তৈরি করেছেন। স্বাধীনতার সুফল অবাধ তথ্যপ্রবাহের সাহায্যে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে গেছেন প্রতিনিয়তই। বস্তুনিষ্ঠতার মাধ্যমে নিবেদিতপ্রাণ একজন সাংবাদিক হিসাবে তিনি বাংলাদেশের জনমানসে সর্বদা উপস্থিত থাকবেন।

কিছু কিছু মানুষ আছেন, তাঁরা যত দীর্ঘ বয়সেই মারা যান না কেন, মনে হয় তাঁদের অকালপ্রয়াণ হয়েছে। তোয়াব ভাইয়ের মৃত্যুর সময় আমার সেটাই মনে হয়েছে। দীর্ঘ ৭০ বছর সাংবাদিকতা করে ৮৮ বছরে ইন্তেকাল করেছেন তোয়াব ভাই। তারপরও মনে হচ্ছে আর কিছুকাল বেঁচে থাকলে দেশ ও জাতির আরও উপকার হতো। তাঁর মতো একজন সাংবাদিক এবং সম্পাদক যে কোনো দেশের জন্যই বিরল সম্পদ। এ ধরনের একজন মানুষের মৃত্যু প্রকৃত অর্থেই দেশের জন্য একটা বিরাট ক্ষতি হিসাবেই বিবেচিত হয়।

মৃত্যু যে কোনো প্রাণেরই অনিবার্য পরিণতি। আমাদের সবাইকেই এ পরিণতি বরণ করতে হবে। কিন্তু তোয়াব ভাই সাংবাদিকতায় যে আদর্শবান আর সৌজন্যের চর্চা করে গিয়েছেন এবং জীবনব্যাপী যে সদাচার আর সংযমের দৃষ্টান্ত তৈরি করে গিয়েছেন, তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের সাংবাদিকতাজগতের বহু কীর্তিমান আছেন, যাঁরা তোয়াব খানের কাছ থেকে এই পেশার দীক্ষা নিয়েছেন। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক হিসাবেও তিনি সেই প্রজন্মের অনেক সাংবাদিক তৈরিতে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর জন্য আমাদের সাংবাদিকতা শুধু পরিবর্তিতই হয়নি, অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

তোয়াব খানের সঙ্গে কথা বললেই মনে হতো তিনি সময়ের বহু আগেই চিন্তা করার ক্ষমতা রাখেন। প্রবীণ বয়সেও তিনি ছিলেন নবীন এবং সদা উৎসুক। আলস্যহীন উদ্যম আর পরিশ্রম ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। এজন্যই বার্ধক্যজনিত নানা অসুস্থতার মধ্যেও একটি নতুন দৈনিক সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে তিনি পিছপা হননি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যার ধমনিতে প্রবাহিত, তিনি কোনো প্রতিবন্ধকতাকেই মোকাবিলা করতে ভয় পান না। আর এজন্যই তোয়াব খান সাংবাদিকতার মতো পৃথিবীর অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় অনন্য ভূমিকা আমৃত্যু পালন করে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন।

তোয়াব ভাই সত্য প্রকাশে ছিলেন অকুতোভয়। সম্পাদকের টেবিলে বসে সত্য প্রকাশে অবিচল থাকাটাই ছিল তাঁর জীবনের দর্শন। রুশ লেখক আলেকজান্ডার আইসেভিচ সোলঝিনিৎসিন (১৯১৮-২০০৮) বলেছিলেন, 'সাধারণ মানুষের কাজ হলো মিথ্যাচারে অংশ না নেওয়া আর কবি, লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের কাজ মিথ্যাকে পরাভূত করা।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'সাহসী মানুষের কাজ হলো মিথ্যায় না অংশ নেওয়া। একটি সত্যি শব্দ গোটা দুনিয়ার চেয়েও বেশি ওজন বহন করে।' তোয়াব ভাই সম্পাদক, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধুর প্রেস সেক্রেটারি–সব দায়িত্বেই এই দর্শনের প্রতিফলন রেখে গেছেন। সত্য প্রকাশ এবং সততাই যে একজন সাংবাদিকের মূল কর্তব্য, সেটাই তোয়াব ভাই সারা জীবন পালন করে গেছেন। আর তাঁর সাহচর্যে যারাই এসেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি সুচারুভাবে এই মন্ত্রটিই বপন করে দিতে চেয়েছেন।

আমার মনে আছে উত্তরবঙ্গে যখন বাংলা ভাইয়ের প্রবল প্রতাপ, তখন তিনি তাঁর সম্পাদিত দৈনিকে সবিস্তারে সেই কাহিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন। প্রতিবেদকদের তিনি সেসময় অকুণ্ঠ সমর্থন আর সাহস জুগিয়ে গেছেন। তিনি সেসময়ে তাদের সত্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন এবং প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার জন্যও উদ্যমী করে তুলেছেন। এটাই হলো সত্য প্রকাশে অবিচল একজন বস্তুনিষ্ঠ সম্পাদকের প্রধান কর্তব্য।

সেজন্যই মনে করি, তোয়াব খানের মতো একজন সাহসী সম্পাদকের আরও বেশ কিছুদিন প্রয়োজন ছিল। আসলে তোয়াব খানদের মতো মানুষের প্রয়োজন সমাজে সব সময়ই থাকবে। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন; কিন্তু তাঁর সত্য প্রকাশের আত্মবিশ্বাস আর আত্মবোধের শিক্ষা আমাদের জন্য রেখে গেছেন। আমরা যদি তাঁর আদর্শ ধারণ করে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারি, তাহলে সেটাই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

লেখক: সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনন্য তোয়াব খান

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

সাতক্ষীরা জেলার রসুলপুরকে বাংলাদেশের একটি অন্যতম আদর্শগ্রাম হিসাবেই আখ্যা দেওয়া যায়। এই গ্রামের অতিসন্নিকটে ভারতের দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলার (বসিরহাট) হাকিমপুর গ্রাম। এই গ্রামগুলোকে রীতিমতো রত্নগর্ভা বলা যায়। সেই রসুলপুর গ্রামেরই খান পরিবারকে বর্ণে, বংশে, ব্যক্তিত্বে মহীয়ান বলা যায়। এই পরিবার সাংবাদিকতার পথিকৃৎ-প্রাণপুরুষ, জাতীয় পত্রপত্রিকার সম্পাদক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, লেখক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বে ভরপুর। আজাদ সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁ, জননেতা আব্দুল বারী খান, জাতীয় অধ্যাপক এমআর খান, প্রখ্যাত প্রকৌশলী শফি খান, জিনাত খান, সম্পাদক আবেদ খান, লেখক তোহা খান ও মন্টু খান, প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব তারিক আনাম খান, সামসুল আনাম খান এবং প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সম্পাদক ও নির্মাতা সাইদুল আনাম টুটুল, নওরোজ কিতাবিস্তানের কর্ণধার কাদির খান, সচিব মুর্শেদ খান চৌধুরী–তাঁরা সবাই এই পরিবার পরিমণ্ডলের সন্তান। আর তাঁদের সবারই অন্যতম মধ্যমণি ছিলেন দেশের এ সময়ের অধিকাংশ ‘সম্পাদকের সম্পাদক’ খ্যাত সদ্যপ্রয়াত শ্রদ্ধেয় তোয়াব খান (১৯৩৪-২০২২)।

সময়ানুবর্তিতা, সংবাদ পরিবেশনা ও উপস্থাপনার নিজস্ব ভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসাধন্য ছিলেন তোয়াব খান। তিনি সবশেষ দৈনিক বাংলা ছাড়াও নিউজবাংলাডটকম নামের একটি অনলাইন মিডিয়ার সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি সময় ধরে অফিসে আসতেন, রাতে প্রথম সংস্করণ বের করে বাড়িতে যেতেন। বাড়িতে গিয়েও কোন খবরে কী পরিমার্জন আনতে হবে, সেই বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। তিনি প্রিন্ট মিডিয়ার সম্পাদক হিসাবেই ছিলেন সমধিক পরিচিত ও যশস্বী। অনলাইনের

মতো আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর মিডিয়ার সঙ্গে ওই অর্থে তাঁর যোগাযোগ না থাকলেও তিনি এই মিডিয়াকেও অনেক ভালোভাবে বুঝতেন। অনলাইন পত্রিকার পাঠক কী ধরনের সংবাদ কী প্রক্রিয়ায় পরিবেশন পছন্দ করে, তা জরিপের নির্দেশনা দিতেন এবং সেই অনুযায়ী সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে কি না, তা যাচাই করতেন। তাঁর মেয়ে তানিয়া খান শোক প্রতিক্রিয়ায় জানান, 'নতুনভাবে দৈনিক বাংলা প্রকাশ হওয়ার জন্য বাবার যে কী একটা আকুতি ছিল! কবে কাজ শেষ হবে, কবে যাব। শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর পরামর্শ করার জিনিসগুলো তাঁকে অনেক মোটিভেটেড রাখত। কাজ ছাড়া একটি দিনও থাকতে পারতেন না। দৈনিক বাংলা যেদিন বের হয়, সেদিনে প্রকাশ করার জন্য একটা লেখা লিখেছিলেন। আমি বলছিলাম, 'তুমি পারছ লিখতে? এত রাত জেগে জেগে লিখছ!' তিনি বলেছিলেন, 'না, লেখাটা দিতে হবে, স্টার্টিং পেপারে দিতে হবে।'

সত্তরের দশকে দৈনিক বাংলায় কাজ করতেন সামসুল আনাম খান। আমি সেসময় দৈনিক বাংলায় লেখালেখি শুরু করি। সামসুল আনাম খানের মাধ্যমে সম্পাদক তোয়াব খানের সঙ্গে পরিচিত হই। আমরা একই জায়গার মানুষ। গুরুগম্ভীর অথচ দরাজদিল মানুষ তোয়াব খানকে সেই থেকে জানতাম। পরে আশির দশকে বাংলাদেশ কবিতা কেন্দ্রের উদ্যোগে 'এশীয় কবিতা উৎসবের সময়' আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা সূত্রে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের প্রেস সচিব তোয়াব খানের সঙ্গে আমার আগের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার আকাশে মরহুম তোয়াব খান একজন ধ্রুবতারা। সব সাংবাদিকের জন্য তিনি সারাজীবন বেঁচে থাকবেন একজন আইকন হিসাবে। তিনি ছিলেন আমাদের দেশ, জাতির জন্য অমূল্য সম্পদ। তিনি ছিলেন নিউজ ও মিডিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান।

১৯৩৪ সালের ২৪ এপ্রিল সাতক্ষীরার রসুলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তোয়াব খান। ছাত্রজীবন থেকেই তোয়াব খান বিভিন্ন পত্রিকায় সমকালীন ইস্যু নিয়ে লেখালেখি করতেন। সাংবাদিক হিসাবে সুদীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য কর্মজীবন ছিল তাঁর। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে যারা কেবল জীবিকা নয়, জীবনব্রত ও সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, তাঁদের একজন তোয়াব খান। ভাষা আন্দোলন থেকে নবোত্থিত বাঙালিচেতনা ও মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তোয়াব খান ও তাঁর সহযাত্রীরা সাংবাদিকতাকেই পেশা হিসাবে বরণ করে নিয়েছিলেন। এ দেশের সাংবাদিকতায় তাঁরাই আমাদের পথিকৃৎ। ১৯৫৩ সালে সাপ্তাহিক জনতার মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। ১৯৫৫ সালে তিনি যোগ দেন দৈনিক সংবাদে।

১৯৬১ সালে দৈনিক সংবাদের বার্তা-সম্পাদক হন তোয়াব খান। সংবাদে তখন ছিলেন শহীদুল্লা কায়সার, রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, সন্তোষ গুপ্তের মতো সাংবাদিক। ১৯৬৪ সালে দৈনিক পাকিস্তান প্রকাশিত হলে তোয়াব খান সংবাদ ছেড়ে সেখানে বার্তা-সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। দৈনিক পাকিস্তান ছিল পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা। কিন্তু সেখানে যারা চাকরি করতেন, তাঁদের বেশির ভাগ ছিলেন বামপন্থি–আহমেদ হুমায়ুন, হাসান হাফিজুর রহমান, নির্মল সেন, ফওজুল করিম, আলী আশরাফ প্রমুখ। ছিলেন শামসুর রাহমান ও আহসান হাবীবের মতো খ্যাতনামা কবিও।

দৈনিক পাকিস্তানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন, এর সংবাদ পরিবেশনা ও উপস্থাপনায় নতুনত্ব ছিল। দৈনিক পাকিস্তানই প্রথম চলতি ভাষায় খবর পরিবেশন করে। এর আগে সব পত্রিকা সাধু ভাষা ব্যবহার করত। সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ের পর দৈনিক পাকিস্তানে সেখানকার জনজীবন নিয়ে ফিচারধর্মী লেখা পাঠককে দারুণভাবে আলোড়িত করে। যেই পত্রিকাটির অফিস উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় মানুষ পুড়িয়ে দিয়েছিল, সেই পত্রিকাই দ্রুত পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে বার্তা-সম্পাদক হিসাবে তোয়াব খানের কৃতিত্বই বেশি।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধেও তোয়াব খানকে আমরা সাংবাদিক হিসাবে সক্রিয় ভূমিকায় পাই। তাঁর লেখা 'পিন্ডির প্রলাপ' কথিকাটি নিয়মিত প্রচারিত হতো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। পাকিস্তানে অবস্থানরত সুহৃৎদের কাছ থেকে তিনি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতেন। স্বাধীনতার পর তোয়াব খান তাঁর ভাষায় পুরোনো কর্মস্থল দৈনিক বাংলায় (দৈনিক পাকিস্তানের পরিবর্তিত নাম) ফিরে আসেন সম্পাদক হিসাবে।

সরকারি পত্রিকার সীমাবদ্ধতার কথা জেনেও তিনি সংবাদ পরিবেশনে বস্তুনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করেছেন। সেসময় দৈনিক বাংলা মুক্তিযুদ্ধের অনেক অজানা তথ্য, রাজনৈতিক নেতা ও সম্মুখসারির মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছে, যা আমাদের ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। পরবর্তী সময়ে দৈনিক জনকণ্ঠে এবং নব্বইয়ের দশকে বছরখানেক দৈনিক বাংলায়ও তিনি সৃজনশীল সাংবাদিকতার ছাপ রেখেছেন। প্রতিবেদন তৈরি থেকে সম্পাদনার কাজে তিনি কনিষ্ঠ সহকর্মীদের হাতেকলমে শিখিয়েছেন। বিপদে-আপদে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, যদিও সব সময় মালিকের বা সরকারের সঙ্গে পেরে ওঠেননি।

১৯৭৩ সালের ২ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়নের ইউসিস অফিস ঘেরাওকে কেন্দ্র করে পুলিশের গুলিতে দুই ছাত্র নিহত হলে গোটা শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। দৈনিক বাংলা বিশেষ টেলিগ্রাম বের করে পুলিশি হত্যার নিন্দা জানিয়ে। এরপর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান ও সম্পাদক তোয়াব খান চাকরি হারান। পরে তোয়াব খান সাংবাদিকতায় ফিরে এলেও হাসান হাফিজুর রহমানের আর ফেরা হয়নি। তাঁকে মস্কোয় পাঠানো হয় প্রেস মিনিস্টার করে।

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তাঁর প্রেস সচিব ছিলেন তোয়াব খান। পরবর্তী সময় তিনি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সাহাবুদ্দীন আহমদেরও প্রেস সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তী সময়ে সরকার তাঁকে ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে সরিয়ে দেয়। তিনি কখনো প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, কখনো প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ সালে দৈনিক জনকণ্ঠ প্রকাশিত হলে তোয়াব খান এর উপদেষ্টা সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। শুরুতে পত্রিকাটি অসংকোচ চিত্তে সত্য প্রকাশ করে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। দেশের চারটি স্থান থেকে একই সঙ্গে পত্রিকা ছাপা শুরুও করে দৈনিক জনকণ্ঠ।

পুরো পাকিস্তান আমল এবং গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশে পেশাদার সাংবাদিকদের কতটা ঝুঁকি ও বৈরিতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে, এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ তোয়াব খান। সাংবাদিকতা ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু সাংবাদিকতায় স্থিত থাকতে পারেননি। যখন যে দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে, সুচারুভাবে পালন করেছেন। অন্যদেরও কর্তব্যনিষ্ঠ হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি কখনো কারও সঙ্গে বিরোধে জড়াননি। প্রায় তিন দশক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার পর সেই পত্রিকা থেকে যেভাবে বিদায় নিতে হয়েছে, সেটা কেবল তোয়াব খানের ক্ষেত্রে ঘটেছে, তা-ই নয়। অগ্রজ ও সহযাত্রী অনেক সাংবাদিক, সাহিত্যিক, আমলা, সুশীলসমাজের প্রতিনিধিসহ অনেকের জীবনেই ঘটেছে। ২০১৬ সালে একুশে পদক পান তিনি। একই বছর তাঁকে সম্মানিত ফেলো নির্বাচন করে বাংলা একাডেমি। এটা জেনে ভালো লাগছে যে, এ বছর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে তাঁর নামে পুরস্কার দেওয়া হবে। পরবর্তী বছর থেকে দৈনিক বাংলা ও নিউজবাংলার পক্ষ থেকে 'তোয়াব খান স্মৃতি পুরস্কার' চালু হবে।

লেখক: সাবেক সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান

পাঠকের চাহিদা বুঝে সাংবাদিকতা করেছেন তোয়াব খান

খায়রুল আনোয়ার

সাংবাদিকতা যে নিছক শুধু চাকরি কিংবা পেশা নয়, একটা ব্রত—তোয়াব খান জীবনের শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকতা করে সেই বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ষাট বছরের বেশি সাংবাদিকতা করা (মাঝে কয়েক বছর গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে ছিলেন), সাব-এডিটর থেকে বার্তা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে সম্পাদক, উপদেষ্টা সম্পাদক হওয়া দেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আমার সুযোগ হয়েছিল তোয়াব খানের অধীনে দুটি দৈনিক পত্রিকায় রিপোর্টার হিসাবে কাজ করার। এর একটি হচ্ছে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে ঐতিহ্যবাহী দৈনিক বাংলা (১৯৯৭ সালের ৩১ অক্টোবর সরকার কর্তৃক বিলুপ্ত)। অপরটি হচ্ছে দৈনিক জনকণ্ঠ। তবে দৈনিক বাংলায় ১৯৯২ সালে সম্পাদক হিসাবে তাঁকে এক বছর বা এর কিছু বেশি সময় পেয়েছিলাম। প্রায় এক দশক তাঁর অধীনে দৈনিক জনকণ্ঠের রিপোর্টিং টিমের সদস্য ছিলাম।

কবি শামসুর রাহমান, আহমেদ হুমায়ুন ও তোয়াব খান—এই তিন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের অধীনে দৈনিক বাংলায় রিপোর্টার হিসাবে কাজ করেছি। ওই সময়ে দেখেছি তোয়াব খান ছিলেন আপাদমস্তক সাংবাদিক। সাংবাদিকতা ছিল যার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। আগামীকালের পত্রিকা পাঠকের সামনে কতটা আকর্ষণীয় করে হাজির করা যায়, এই ভাবনায় মগ্ন থাকতেন। দৈনিক বাংলায় তিনি যোগ দেওয়ার আগে

> ওই সময়ে দেখেছি তোয়াব খান ছিলেন আপাদমস্তক সাংবাদিক। সাংবাদিকতা ছিল যার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। আগামীকালের পত্রিকা পাঠকের সামনে কতটা আকর্ষণীয় করে হাজির করা যায়, এই ভাবনায় মগ্ন থাকতেন

সম্পাদকের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন (শনিবার) রিপোর্টারদের মিটিং হতো। এতে গেল সপ্তাহের রিপোর্টারদের নিউজ নিয়ে আলোচনা, কোন নিউজ মিস হয়েছে, আরও কী কী করা যেত–এসব পর্যালোচনা হতো। পাশাপাশি আগামী সপ্তাহের জন্য পরিকল্পনা করা হতো। তোয়াব খান যোগ দেওয়ার পর সপ্তাহে একদিনের পরিবর্তে ছয়দিন মিটিং চালু করেন। প্রথমে রিপোর্টিং টিমের সঙ্গে, পরে সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে। দৈনিক জনকণ্ঠেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। অফ-ডে বা ছুটি বলে তোয়াব খানের অভিধানে কোনো শব্দ ছিল না। শুধু শুক্রবার সকালে অফিসে আসতেন না।

দৈনিক বাংলায় তিনি সিনিয়র রিপোর্টারদের পর্যায়ক্রমে ঢাকার বাইরে পাঠানো শুরু করেন। কাউকে হয়তো দিনাজপুর পাঠানো হলো। তিনি ১০ থেকে ১৫ দিন সমগ্র উত্তরাঞ্চল ঘুরে সেখানকার জনজীবন, চাষাবাদ, যোগাযোগব্যবস্থা, প্রান্তিক মানুষের অভাব-অনটন নিয়ে সিরিজ রিপোর্ট করবেন। তবে এই সিরিজ হবে ফিচারধর্মী। রিপোর্টার ঢাকায় ফিরে অথবা উত্তরাঞ্চল থেকেই রিপোর্ট পাঠাতেন। ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশিত হতো। উত্তরাঞ্চলের রিপোর্টার ফিরে আসার আগেই আরেকজন সিনিয়র রিপোর্টারকে হয়তো সিলেটে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এভাবে সারা দেশের জনজীবন দৈনিক বাংলায় ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি রাজনীতি-অর্থনীতির খবর, অপরাধ, খেলাধুলা–এককথায় যা কিছু নিয়ে সাংবাদিকতা, এর সবকিছু থাকত পত্রিকার পাতায়।

তোয়াব খান যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর সহযোগী সম্পাদক হিসাবে দৈনিক বাংলায় যোগ দেন আরেক প্রবীণ সাংবাদিক ফওজুল করিম (তারা)। তিনি একসময় দৈনিক বাংলায় জাঁদরেল বার্তা-সম্পাদক ছিলেন। তাঁরা দুজন দীর্ঘদিনের সহকর্মী শুধু নন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। ফওজুল করিম দায়িত্ব নেওয়ার পর ফিচার পাতাসহ বিভিন্ন পাতা নতুন করে বিন্যাস করা হয়। এমনিতেই নিউজের ট্রিটমেন্ট, শিরোনাম, মেকআপ-গেটআপ, ছবি প্রভৃতির জন্য দৈনিক বাংলার আলাদা সুনাম ছিল। ট্রাস্টের পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক বাংলা পাঠকের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত ছিল। যদিও সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার শেষ পর্যায়ে তা আর থাকেনি।

তোয়াব খান নিজে যেমন সার্বক্ষণিক সাংবাদিক ছিলেন, তেমনই চাইতেন রিপোর্টাররাও সব সময় রিপোর্টের পেছনে ছুটবেন। শুধু ঢাকার বাইরে থেকে নয়, ঢাকা থেকেও বিভিন্ন বিষয়ে সিরিজ রিপোর্ট করাতেন। প্রতিদিনের মিটিংয়ে তিনি রিপোর্টারদের নতুন নতুন আইডিয়া দিতেন। শুধু আইডিয়া দিয়ে ক্ষান্ত হতেন না, সেই রিপোর্ট আদায় করে নিতেন। কোনোভাবেই তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ ছিল না। তিনি নতুন করে যখন সম্পাদকের দায়িত্ব নেন, তখন দেশে চাঁদাবাজির ঘটনা বাড়ছিল। চাঁদাবাজি নিয়ে আমি অনুসন্ধানী সিরিজ রিপোর্ট করার জন্য সাপ্তাহিক সভায় প্রস্তাব করি। তোয়াব খান এতে সম্মতি জানান। পুরান ঢাকা, নতুন ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে মাসব্যাপী অনুসন্ধান চালিয়ে আমি সাত পর্বের সিরিজ জমা দিই। 'চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য' নামে প্রতিবেদন-গুচ্ছ গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়। পরে এটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্যাটাগরিতে ফিলিপস পুরস্কার পায়। তোয়াব খান যতদিন দৈনিক বাংলায় ছিলেন, আমাকে নতুন নতুন বিষয় নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন করতে বলতেন।

সকালের মিটিংয়ে তিনি থাকতেন গুরুগম্ভীর। আবার সন্ধ্যায় তাঁর অন্যরূপ। তখন দেখা যেত হাসিখুশি মুখ। দৈনিক জনকণ্ঠে উপদেষ্টা সম্পাদক হওয়ার পর দৈনিক বাংলা থেকে কয়েকজন সাংবাদিকের পাশাপাশি আমাকেও যোগ দেওয়ার জন্য খবর পাঠান। আমি নতুন পত্রিকার ভবিষ্যৎ কোথায় দাঁড়াবে ভেবে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলাম। বেশ কয়েক মাস পর তিনি আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তোয়াব খান সেদিন বলেছিলেন, 'তুমি কি ভয় পাচ্ছ? আমি যদি এই বয়সে একটি চ্যালেঞ্জ নিতে পারি, তোমার তো ভয় পাওয়ার কথা নয়। তোমার বয়স কম, বিয়েও তো করোনি। খালেকের (প্রধান প্রতিবেদক ছিলেন আব্দুল খালেক) সঙ্গে দেখা করে কবে জয়েন করবে জানিয়ে যাও। বেশি সময় নিও না। ১৯৯৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর দৈনিক জনকণ্ঠে যোগ দিই। ২০০৩ সালের মার্চে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে যোগ দেওয়ার আগ পর্যন্ত দৈনিক জনকণ্ঠেই ছিলাম।'

দৈনিক জনকণ্ঠ দেশের প্রথম সংবাদপত্র, যা ঢাকাসহ পাঁচটি জেলা থেকে প্রকাশিত হতো। কাকডাকা ভোরে উত্তরবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দৈনিক জনকণ্ঠ পাঠকের হাতে পৌঁছে যেত। তোয়াব খান সবকিছুর ওপর জোর দিলেও রিপোর্টিং টিমের দিকে ছিল বিশেষ নজর। দৈনিক জনকণ্ঠেও শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে মিটিংয়ে উপস্থিত থাকা ছিল বাধ্যতামূলক। ওই সময়ে অ্যাসাইনমেন্ট থাকলে অথবা বিশেষ রিপোর্টের কাজ ছাড়া কারও পক্ষে মিটিং ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না। যত ভালো ভালো রিপোর্ট নিয়ে পত্রিকা বের হোক না কেন, প্রায়ই তিনি বলতেন, কিছুই হচ্ছে না–এভাবে চলতে পারে না। পত্রিকা পাঠকের কাছে জনপ্রিয় করার জন্য সবাইকে তিনি এভাবে চাপে রাখতেন।

বছর না ঘুরতে দৈনিক জনকণ্ঠ পাঠকমহলে স্থান করে নেয়। একপর্যায়ে দৈনিক জনকণ্ঠ প্রচারসংখ্যা ও গুরুত্ব সবকিছু মিলিয়ে শীর্ষস্থানে চলে যায়। সে এক ভিন্ন ইতিহাস, যে পত্রিকার উত্থানেই কেবল তোয়াব খানের ভূমিকা ছিল। তাঁর স্মৃতির প্রতি রইল আমার গভীর শ্রদ্ধা।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

তোয়াব খান–নিরন্তর অনুপ্রেরণা

তারিক আনাম খান

তোয়াব খান আমার মামা। পারিবারিক আন্তরিক ভাষায় আমার 'কেলো মামু'। তিনি একাধারে আমার মামা (মায়ের মামাতো ভাই), ফুপাতো ভাই, আবার বৈবাহিক সূত্রে দুলাভাই। তবে তিনি ছিলেন আমার 'কেলো মামু'।

হয়তো কেলো মামুর মধ্যে অদ্ভুত এক নিবিড়তা, এক আপন গন্ধ খুঁজে পেতাম বলেই তিনি সব সম্পর্কের ওপরে আমার মামু। আবার বয়সে তিনি আমার মায়ের পিঠাপিঠি ছিলেন। মাত্র এক বছরের বড়ো ছিলেন মা। তাই 'কেলো মামু' শব্দ দুটোর সঙ্গে হাজির হয়ে যেত আমাদের ছোটোবেলা, আমাদের গৌরব, আমাদের অনুকরণের এক নাম। এই খাঁ পরিবারের সঙ্গে অনুকরণীয় সব নাম আমাদের ফুপাতো ভাইদের মধ্যেই ছিল। যেমন: শফি খান, ডা. এমআর খান, সহি খান–তেমনই একজন তোয়াব খান।

আমাদের ভাইবোনসহ অনেকের কাছে বিস্ময় ছিল এ রকম অসম্ভব ফরসা, সুদর্শন একজন মানুষের নাম 'কেলো' কী করে হয়! আর এই মানুষটাকে সিনেমায় কেউ 'চান্স' দেয় না কেন? তোয়াব খান আমার জন্মের আগে থেকেই সাংবাদিক। জীবনের শেষদিন পর্যন্তও সাংবাদিক।

আমাদের বাড়িতে সংবাদপত্র পাঠ ছিল একটি নিয়মিত অভ্যাস। আমার চাচারাও সংবাদপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সেই আজাদ পত্রিকা ও মওলানা আকরম খাঁর আমল থেকে পত্রিকার সঙ্গে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা শুরু। এ কারণে পত্রিকা, সংবাদপত্র, খবর মানেই কেমন যেন আত্মীয় আত্মীয় গন্ধ লাগে। বাড়িতে খবরের কাগজ কমপক্ষে দুটো আসতই। পড়ার প্রতি, খবর জানার প্রতি যে প্রবল

আগ্রহ, এর বড়ো কারণ ছিলেন আমার চাচা শামসুল আনাম খান, আর অবশ্যই তোয়াব খান।

প্রথমে পড়তাম 'সংবাদ'। মনে হতো কি সাহসী, অকুতোভয় আর প্রগতিশীলতা! পত্রিকাটির সাহিত্য পাতাটিও ছিল অদ্ভুত আকর্ষণীয়। সঙ্গে থাকত 'পূর্বদেশ', পরে দৈনিক পাকিস্তান। দৈনিক পাকিস্তান তখন সরকারি পত্রিকা। কিন্তু সেখানে মিথ্যাচার অন্তত ছিল বলে মনে হতো না। এর কারণ এ পত্রিকায় ছিলেন তোয়াব খানসহ সেসময়কার অকুতোভয় সংবাদকর্মীরা। আর দৈনিক পাকিস্তানের বড়ো কৃতিত্ব এর ছাপা, লেখা, চলতি কথ্য ভাষা আর ঝকঝকে চৌকশ প্রকাশনা। ছোটোদের পাতা, সাহিত্য পাতা কী আকর্ষণীয় আর আধুনিক। এই যে তোয়াব খানসহ একদল তেজি মানুষ সংবাদপত্রে কাজ করার ঝুঁকি জেনেও এই সাংবাদিকতা পেশাকেই ধ্যানজ্ঞান করেছেন, তা আজও বড়ো প্রেরণার। তখন সাংবাদিকদের চাকরির নিরাপত্তা আর বেতনও খুব বেশি ছিল না। সেটিও আমরা জানতাম।

তোয়াব খান, আমার কেলো মামু আপাদমস্তক একজন সাংবাদিক। ঢাকায় এসে তাঁর কাছাকাছি কদিন থেকে দেখেছি–তাঁর দেখা পাওয়াটাই ছিল দুঃসাধ্য। সংবাদপত্রের কাজ শেষে গভীর রাতে তিনি বাড়ি ফিরতেন। আবার সকালে উঠেই নিজের কাগজখানায় একবার চোখ বুলিয়ে অন্য কাগজে কী ছাপা হলো, তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। ভুল কিছু লিখলে সেটার যুক্তি-তথ্য দিয়ে বাড়ির সবাইকে জানাতেন। কিংবা খবরের ভেতরের খবরটা মাঝেমধ্যে প্রকাশ করতেন। কিন্তু ওই যে সাংবাদিকরা যেমন 'সোর্স' জানান না, তেমনই তাঁর বাড়ির লোকজনও জানতে পারতাম না খবরের উৎস। তবে খবর নিয়ে বাড়ির লোকের সমালোচনা তিনি শুনতেন।

মাঝেমধ্যে আমার কাছে তাঁকে রহস্যমানব মনে হতো। ব্যক্তিজীবনে একেবারেই বাহুল্যবর্জিত আপাদমস্তক ভদ্রলোক মানুষ ছিলেন আমার মামু তোয়াব খান। কোনো কিছু নিয়ে তাঁকে কখনো বাড়াবাড়ি করতে দেখিনি। পোশাক, খাওয়াদাওয়া, ঘর-দুয়ার নিয়ে তার বাড়াবাড়ি ছিল না। এরকম অভিযোগহীন, কাজে ও সংবাদপত্র সৃজনে মগ্ন অতিমাত্রার ভদ্রলোক তোয়াব খান তাই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

এ অবস্থার ব্যত্যয় কোনোদিন দেখিনি, এমনকি যখন তোয়াব খান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার কাছাকাছি থেকেছেন, তখনও দেখিনি। শৃঙ্খলা, কর্মনিষ্ঠা আর পেশাদারির চূড়ান্ত নিদর্শন হয়ে তিনি থেকেছেন। তাঁর বাম হাতও বোধহয় জানতে পারত না, ডান হাত কী করছে। ক্ষমতার এত কাছাকাছি থেকেও কত সুবিধাই তো কত লোক করে নেয় বা নিতে পারে। কিন্তু সেখানেও তোয়াব খান নির্লোভ ছিলেন।

একেবারে আপন চেষ্টা, শ্রম ও নিষ্ঠায় তোয়াব খান নিজেকে এতদূর নিয়ে গেছেন, তা আমাদের কাছে অনুকরণীয় ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ছিল, থাকবে। তেমনই সংবাদপত্র, সংবাদ, সাংবাদিকতা যে একটি সৃজনশীল ও সার্বক্ষণিক পেশা, তা তোয়াব খানের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে–থাকবে। নির্লোভ ও একনিষ্ঠ হয়ে নিজ কর্মের প্রতি মগ্ন থেকে অভিযোগহীন এক জীবনযাপনে অনুপ্রেরণা আমার কেলো মামু–আছেন, থাকবেন।

লেখক: নাট্যব্যক্তিত্ব

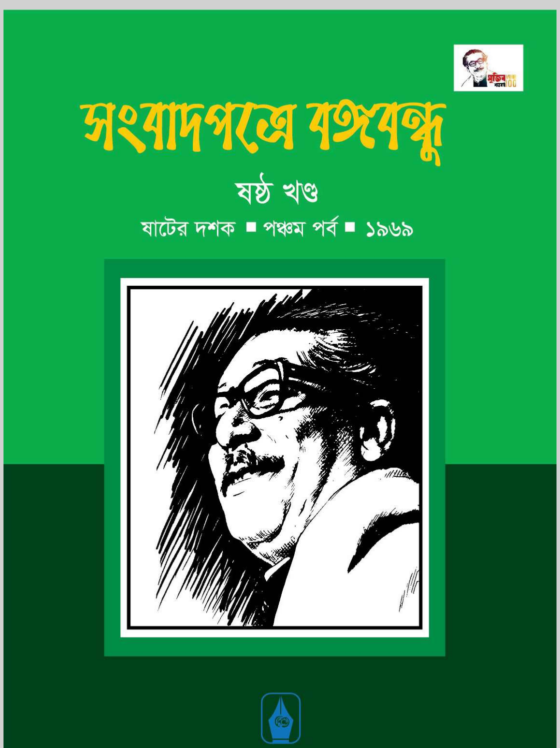

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

তোয়াব খান সংবাদ সারথির প্রয়াণ

সাইফুল আলম

বাংলাদেশের সংবাদপত্রজগতের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বদের অন্যতম নক্ষত্র তোয়াব খান আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছেন। সুদীর্ঘ এক বর্ণাঢ্য সাংবাদিকতা জীবনের অবসানে আমরা হারালাম এক অগ্রজ পথপ্রদর্শককে।

উপমহাদেশের এক কিংবদন্তিতুল্য সাংবাদিক খুশবন্ত সিংয়ের একটি উক্তি এ রকম–'কর্মই ধর্ম, ধর্ম কর্ম নয়।' কর্মকে যারা আরাধনায় পরিণত করতে পারেন, তাদেরই একজন তোয়াব খান। তাঁর জীবন থেকে একটা উদাহরণ চয়ন করি। তাঁর অনেক আদরের কন্যা এষা খানের আকস্মিক অকালমৃত্যুর দিনের ঘটনা। তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যার অকালমৃত্যুতে তখন আত্মীয়-পরিজনরাই শোকাকুল; কিছুতেই সান্ত্বনা মিলছে না। কে কাকে সান্ত্বনা জোগাবে, এমনই যখন দিশেহারা বাস্তবতা, তখন সবাই উদ্‌বিগ্ন পিতা তোয়াব খানকে নিয়ে। তিনি কীভাবে সামলে উঠবেন এই বেদনা।

বলা হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বস্তু হচ্ছে পিতার কাঁধে সন্তানের কফিন। আত্মীয়-স্বজন সবাই যখন তোয়াব খানকে নিয়ে যারপরনাই উদ্‌বেগাকুল, তখন তিনি তাঁর কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। সবাই তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন প্রাণপণ। কিছুতেই তাঁর এমন শোকগ্রস্ত অবস্থায় কর্মক্ষেত্রে যাওয়া ঠিক হবে না; এমন বলতে লাগলেন কেউ কেউ। তখন তাদের সেই উদ্‌বেগের জবাবে তিনি বললেন,

'আমাকে অফিসে যেতে দাও, কাজের ভেতরেই আমি সুস্থ থাকব।' উদ্‌বিগ্ন স্বজনদের বুঝিয়ে তিনি অফিসে গেলেন এবং কাজে ডুবে গেলেন। কাজের ভেতরে ডুবে অতিক্রম করলেন সন্তান হারানোর বেদনাকে। এই হচ্ছেন তোয়াব খান। আমাদের অনুসরণীয় অগ্রজ।

আমাদের পবিত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'মানুষের কর্মের অধিকার আছে ফল সৃষ্টিকর্তার এখতিয়ারে।' গীতার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বয়ান—'কর্ম করাই তোমার অধিকার, ফলাফল নয়, তাই তুমি কর্মফলে বাসনা রেখো না এবং কর্মত্যাগ করার বিচার করো না।' না, কর্মকে ত্যাগ করা যায় না—শোকে, দুঃখে, দুর্যোগে, দুর্বিপাকে। কর্মের ধর্মেই মানুষকে অটল থাকতে হয়—সেটাই মানবিকতা, সেটাই মনুষ্যত্ব।

দুই.

বাংলাদেশের সংবাদপত্রকে যারা শিল্পরূপে গড়ে তুলতে অবদান রেখেছেন, তাঁদের অন্যতম প্রধান পুরুষ তোয়াব খান। সুদীর্ঘ সাংবাদিকতার জীবনের পর্বে পর্বে তিনি অবদান রেখেছেন। সংবাদ, দৈনিক বাংলা, দৈনিক জনকণ্ঠ এবং অতিসম্প্রতি পুনঃপ্রকাশিত দৈনিক বাংলায় তিনি কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন সাংবাদিকতায়।

তিন.

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যেমন অংশ নিয়েছেন, তেমনই যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে দেশ পুনর্গঠনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন গোটা জীবন।

সাংবাদিকের জীবন নিরন্তর চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পথচলার। সেই পথ প্রায়ই বন্ধুত্বের নয় বরং বন্ধুর। ফলে তাঁকেও জীবনের নানা পর্বে পোহাতে হয়েছে বিড়ম্বনা। যুদ্ধোত্তর স্বদেশের শুরুর দিকেই চাকরিচ্যুত হয়েছেন। ছাত্রমিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনায় দৈনিক বাংলার টেলিগ্রাম বের করার কারণে। তারপর একটা দীর্ঘসময় সাংবাদিকতা থেকে দূরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। নানা সরকারি দায়িত্ব পালনের সূত্রে সেসব কাজের ফাঁকেই তিনি এই পেশাটির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী ছিলেন। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছেন। শুধু তাই নয়, সরকারি দায়িত্ব পালনের সময়ও তিনি অনেক অনুজ সংবাদকর্মীকে সুরক্ষা দিয়েছেন। সেটা তাঁর জীবনের আরেক অধ্যায়। সে কথা লেখার দায়িত্ব তাঁদেরই, যাঁরা তাঁর সেই স্নেহে সিক্ত হয়েছেন।

চার.

সাংবাদিকতা একটি দায়িত্বশীল পেশা। সাহসী পেশা। সমাজের স্বার্থে, সমষ্টির স্বার্থে যেমন একজন সাংবাদিককে সাহসী হতে হয়, তেমনই দায়িত্বশীলতার পরিচয়ও দিতে হয়। তিনি অনুজ সংবাদকর্মীদের কাজের মধ্য দিয়ে বিষয়গুলো হাতেকলমে শিখিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন, এটা তাঁদেরই ভাষ্য।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তিনি আমৃত্যু লালন করেছেন, তা গতানুগতিক স্লোগানের আবহে নয়—প্রকৃত দেশপ্রেমের নিরিখে। যে চেতনা আপসহীন সব অনিয়মের বিরুদ্ধে, সব সময়।

তাঁর প্রয়াণে আমরা এক অনুসরণীয় অগ্রজকে হারিয়েছি। দেশ হারিয়েছে কর্মবীর সন্তানকে। তাঁর কাজ সব সময়ই আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। অনুপ্রাণিত করবে।

লেখক: সম্পাদক, যুগান্তর; সাবেক সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা

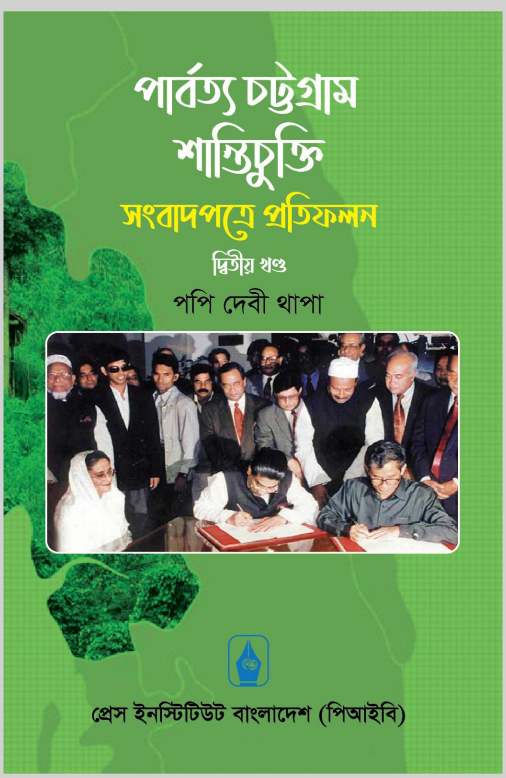

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

একটি সংবাদেই সবকিছু স্মৃতি

ওবায়দুল কবির

তোয়াব ভাইকে প্রথম দেখেছিলাম ৫৫ মতিঝিল তৎকালীন দৈনিক জনকণ্ঠ অফিসে। সময়টা সম্ভবত ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। আমরা দৈনিক জনকণ্ঠে শিক্ষানবিশ রিপোর্টার হিসাবে যোগদান করেছিলাম একই সালের ১৫ নভেম্বর। দৈনিক জনকণ্ঠ প্রকাশের সময় নির্ধারিত ছিল ১৯৯২ সালের ১৬ ডিসেম্বর। অফিসে একদিন অগ্রজ সাংবাদিক মোস্তাক মোবারকী ভাই সংবাদ দিলেন, তোয়াব ভাই জনকণ্ঠে যোগদান করছেন। মোবারকী ভাই তখন জনকণ্ঠে। তিনি আরও বললেন, 'তোমরা খুবই ভাগ্যবান। আমার শিক্ষকেরও শিক্ষক তোয়াব ভাই। তোমরা তাঁর কাছে কাজ শেখার সুযোগ পাচ্ছ।' মোবারকী ভাইয়ের সেই কথা পরবর্তী সাংবাদিকতা জীবনে মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। একটানা ২৮ বছর তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজ শিখেছি। এখন মনে হয়, তোয়াব ভাইয়ের কাছে কাজ শেখার জন্য ২৮ বছরই যথেষ্ট নয়। আরও অনেক কিছু শেখা বাকিই রয়ে গেল।

শিক্ষক তোয়াব ভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘসময়ের অনেক স্মৃতি। সবকিছুই আজ হৃদয়ে বাজছে সানাইয়ের করুণ সুরের মতো। ৩২ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে দৈনিক জনকণ্ঠের সাবেক সম্পাদক, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদের কাছে পেশায় বিকাশ লাভ করার সুযোগ, প্রেরণা, উৎসাহ পেয়েছি। এক যুগ ধরে সেই সময়ের প্রধান প্রতিবেদক প্রয়াত খালেক ভাইয়ের কাছে হাতেকলমে শিখেছি সংবাদ পরিবেশন। তোয়াব ভাইয়ের কাছে শিখেছি সাংবাদিকতা, পেশার বিশালত্ব ও গভীরতা। তাঁরা তিনজনই এখন অতীত। চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে। সাংবাদিকতা পেশা সমৃদ্ধ করতে রেখে গেছেন অনেক কিছু।

একজন সাংবাদিক কতটা পেশাদার হতে পারেন, তোয়াব ভাই ছিলেন এর অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁকে কাছ থেকে দেখলে আর কাউকেই দেখারই প্রয়োজন নেই। শুধু পেশা নয়, তাঁর শখ, আহ্লাদ, ধ্যানজ্ঞান, সাধনা, গবেষণা–সবই ছিল সাংবাদিকতা ঘিরে। সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতার বাইরে তাঁর আর কোনো জগৎ ছিল না। সামাজিক জীবন দূরের কথা, পারিবারিক জীবনও ছিল সাংবাদিকতার কাছে তুচ্ছ। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম পত্রিকার পাতায় চোখ রাখা থেকে শুরু হতো তাঁর দিন।

রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, ফিচারসহ সাংবাদিকতার নতুন নতুন ধারণা নিয়ে কাটত সারা দিন। দেশ থেকে প্রকাশিত অখ্যাত পত্রিকাসহ সব সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বোলাতেন মনোযোগ দিয়ে। নিয়মিত পড়তেন এদেশে পাওয়া যায় এমন সব বিদেশি পত্রিকা। এই পাঠাভ্যাস থেকে ধারণা নিয়ে কাজে লাগাতেন পত্রিকার পাতায়। রাতে ঘুমাতেন হয়তো বিবিসি, সিএনএন অথবা কোনো সংবাদ চ্যানেলের পর্দায় চোখ রেখে। প্রায় নব্বই বছরের একজন মানুষের জীবনধারা কীভাবে এমন হতে পারে, এটি ছিল এক বিস্ময়।

১৯৯২ সালে তোয়াব ভাই দৈনিক জনকণ্ঠে যোগদান করেছিলেন উপদেষ্টা সম্পাদক হিসাবে। তখন আমাদের পত্রিকার ডামি কপি বের হতো। দেখেশুনে তোয়াব ভাই বললেন, ১৬ ডিসেম্বর পত্রিকা বের করা যাবে না। আরও প্রস্তুতি প্রয়োজন। পত্রিকার সম্পাদক আতিকউল্লাহ খান মাসুদ তা মেনে নিলেন। পরবর্তী দীর্ঘ সময় দেখেছি, পত্রিকা নিয়ে সম্পাদক কখনো তোয়াব ভাইকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন না। বাংলাদেশে এত স্বাধীনতা নিয়ে কোনো সাংবাদিক পত্রিকা বের করতে পেরেছিলেন কি না, আমার জানা নেই। জনকণ্ঠে যোগদান করার দিনই শুরু হয় তোয়াব ভাইয়ের নতুন চিন্তাভাবনার প্রতিফলন। সকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিটিং করে সারা দিনের পরিকল্পনা করার রীতি তিনিই পত্রিকায় চালু করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আসতে থাকে নতুন নতুন আইডিয়া। আমাদের শেখাতে শুরু করেন রিপোর্ট কী, কীভাবে রিপোর্ট লিখতে হয়, কোথায় রিপোর্ট পাওয়া যায় প্রভৃতি। তোয়াব ভাইয়ের আইডিয়া নিয়ে আমরা ছুটতে থাকি চারদিকে। তিনি সন্তুষ্ট হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৯৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবসে জনকণ্ঠ বাজারে আসবে। সেই থেকে যাত্রা শুরু।

সাংবাদিক হিসাবে তোয়াব ভাইকে যতই দেখেছি, ততই বিস্মিত হয়েছি। একজন মানুষের জানার পরিধি কতটা বিস্তৃত হতে পারে, তা তোয়াব ভাইকে কাছ থেকে না জানলে কেউ ভাবতেই পারবে না। তাঁর সাংবাদিকতা শুরু হয়েছিল সেই পঞ্চাশের দশকে। এই দেশের অনেক ইতিহাসের সাক্ষী ছিলেন তিনি। দেশের তৎকালীন প্রায় সব প্রধান সংবাদপত্রে কাজ করেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন দৈনিক পাকিস্তানে। ওখান থেকে পালিয়ে ভারতে গিয়ে কলম ও শব্দসৈনিক হয়ে ওঠেন অনন্য মেধায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁর রচনা ও উপস্থাপনায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'পিন্ডির প্রলাপ' মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল এবং মুক্তিপাগল বাঙালির অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি প্রথমে দৈনিক বাংলার সম্পাদক, পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব, আরও পরে রাষ্ট্রপতি এইচএম এরশাদ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের প্রেস সচিব, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক এবং আবারও দৈনিক বাংলার সম্পাদক হিসাবে বিশাল অভিজ্ঞতার ভান্ডার অর্জন করেন। ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার শাসনামলে তাঁকে দৈনিক বাংলার সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর পরই তিনি যোগদান করেন দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক হিসাবে। এই পত্রিকায় তিনি একনাগাড়ে দীর্ঘ ২৮ বছর অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি শুধু জনকণ্ঠ নয়, দেশের সংবাদপত্রজগৎ এবং রাষ্ট্রের জন্য রেখেছেন অনেক অবদান। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে তিনি কখনো আপস করেননি। এজন্য তাঁকে জেলে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ২০১৬ সালে তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

বয়সের দীর্ঘ ব্যবধানেও তোয়াব ভাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে, কাজ করতে সমস্যা হয়নি। শিক্ষানবিশ রিপোর্টার থেকে শুরু করে তাঁর হাত ধরে স্টাফ রিপোর্টার, সিনিয়র রিপোর্টার, বিশেষ সংবাদদাতা, প্রধান প্রতিবেদক (টানা ১৫ বছর) এবং ডেপুটি এডিটর পদে উন্নীত হয়েছি। অগ্রজ, বস, শিক্ষক ছাড়িয়ে কখন যে তাঁর অভিভাবকত্বের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি, টেরই পাইনি। পত্রিকার সম্পাদক আতিকউল্লাহ খান মাসুদের পাশাপাশি তোয়াব ভাই জড়িয়ে গিয়েছিলেন আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায়। পেশার পাশাপাশি তিনি খোঁজখবর রাখতেন তাঁর সহকর্মীদের ব্যক্তিজীবনের। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন কারও সংকট-সমস্যায়। সহকর্মীদের জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা, কর্মস্থলে সহকর্মীদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা ছিল তাঁর পেশাগত দায়িত্বের অধীন। এই দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত।

তোয়াব ভাই এমন একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, যাঁর নির্দেশ অমান্য করা, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করা কিংবা পরামর্শ উপেক্ষা করা ছিল অসাধ্য। দীর্ঘ ১৫ বছর প্রধান প্রতিবেদকের দায়িত্ব পালনের সময় তাঁর সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হয়েছে। বিতর্কও হয়েছে অনেক। এই বিতর্ক কিংবা মতবিরোধ কখনো বেয়াদবির পর্যায়ে যায়নি। তাঁর একটি অসাধারণ গুণ ছিল, কারও প্রতি তিনি কখনোই প্রতিহিংসাপরায়ণ হতেন না। তর্ক-বিতর্কে তিনি হয়তো মাঝেমধ্যে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, আবার কিছুক্ষণ পরই স্বাভাবিক হয়ে যেতেন। সেই ভুবন ভুলানো হাসিতে ভুলিয়ে দিতেন একটু আগে যা হয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা বা গাফিলতির কারণে তিনি কারও প্রতি বিরক্ত হতেন, প্রচণ্ড বকাঝকা করতেন। এর প্রতিফলন কখনো ব্যক্তিগত জীবনে ঘটতে দিতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে যাঁকে হয়তো তিনি সবচেয়ে পছন্দ করতেন, তাঁকেও পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ছাড় দিতেন না। ব্যক্তিসম্পর্ক এবং পেশার এই অপূর্ব সম্মিলন একমাত্র তোয়াব ভাইয়ের পক্ষেই সম্ভব ছিল। দীর্ঘসময় ধরে তাঁর এই গুণটি আমার ব্যক্তিজীবনে ধারণ করার চেষ্টা করেছি। এর ফলও আমি পেয়েছি।

অতিসম্প্রতি আমি দৈনিক জনকণ্ঠের রিপোর্টিং ছেড়ে সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করি। সূচনা হয় আমার লেখালেখির নতুন জগৎ। হাঁটি হাঁটি পা পা করে শুরু হয় সম্পাদকীয়, উপসম্পদকীয় লেখা। তোয়াব ভাই তখন দৈনিক জনকণ্ঠের সঙ্গে আর ছিলেন না। বেশির ভাগ সময় অসুস্থই থাকতেন। এরপরও তিনি নিয়মিত পড়তেন আমার লেখা উপসম্পাদকীয়। মাঝেমধ্যে ফোন করে প্রশংসা করতেন, আবার কিছু কিছু ভুলও ধরিয়ে দিতেন। সর্বশেষ তিনি রাজনীতি নিয়ে আমার একটি লেখার খুব প্রশংসা করেছিলেন। সম্ভবত এটিই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা। জনকণ্ঠে নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আমাকেও রিপোর্টিং মিটিংয়ে ফিরতে হয়েছে। রিপোর্টিং মিটিং ছিল তোয়াব ভাইয়ের চালু করা এবং তাঁর খুবই পছন্দের। এই মিটিংয়ে রিপোর্টারদের দিকনির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি তিনি বিশাল অভিজ্ঞতার ভান্ডার থেকে সবাইকে সমৃদ্ধ করতেন। শনিবার (পহেলা অক্টোবর) তার এই প্রিয় রিপোর্টিং মিটিংয়ে বসেই মর্মান্তিক সেই সংবাদটি পেলাম। জনকণ্ঠের সাবেক প্রধান প্রতিবেদক রেজোয়ানুল হক রাজা ফোন করে জানালেন, 'তোয়াব ভাই আর নেই'। কানে বারবার এই কটি শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। ফোনটি ছেড়ে মিটিংয়ে সবাইকে দুঃসংবাদটি জানালাম। সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মুহূর্তে পালটে গেল মিটিংয়ের চিত্র। সাবেক সহকর্মীদের মধ্যে নেমে এলো বিষাদের ছায়া। একটি ফোনের সংবাদেই সবকিছু হয়ে গেল অতীত। তবুও জীবন থেমে থাকে না। কষ্ট করে হলেও মিটিংয়ের কাজ শেষ করা হলো। মিটিংয়ে আর একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলাম না। বারবার ঝাপসা হয়ে উঠছিল চোখের পাতা। একটি নয়, দুটি নয়, ২৮ বছরের পথচলা। দীর্ঘসময় ছাতার মতো মাথার ওপর ছায়া হয়ে থাকা তোয়াব ভাই আর নেই। চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। আর কোনোদিন দরাজ গলায় প্রশ্ন করবেন না, 'কী খবর তোমার?' আর বলবেন না, 'লেখাটা ভালো হয়েছে, তবে আরও এই...দিকে নজর দিলে ভালো করতে।'

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক জনকণ্ঠ

তোয়াব খানঃ দীক্ষাগুরুর স্মরণ শরণ

হাসান হাফিজ

নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকের কথা। তখন আমি ছিলাম দৈনিক বাংলার সিনিয়র রিপোর্টার। তোয়াব খান নতুন সম্পাদক হয়ে এসেছেন। ১৯৭৬ সালে যখন ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন যোগ দিই দৈনিক বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার হিসাবে। তখন সম্পাদক ছিলেন কবি শামসুর রাহমান। ১৯৮০ সালে যখন স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে পূর্ণকালীন সাংবাদিক হিসাবে নিযুক্তি পাই, কবি শামসুর রাহমান তখনও সম্পাদক। দৈনিক বাংলায় সিনিয়রদের কাছে তোয়াব ভাইয়ের অনেক গল্প শুনেছি। পূর্বতন দৈনিক পাকিস্তানে নতুন ধারার মেকআপ, বিষয়শৈলী সংযোজনে তাঁর কৃতিত্ব, নিউজের ট্রিটমেন্ট, খবর নির্বাচনে মুনশিয়ানা, অভিনবত্ব, সৃষ্টিশীলতায় সিনিয়ররা ছিলেন পঞ্চমুখ। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সম্পর্কে অনেক আগ্রহ, কৌতূহল ছিল। মনোবাসনা ছিল, আহা যদি তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেতাম! সেই সৌভাগ্য হলো অবশেষে। এ দফায় তিনি সম্পাদক হিসাবে মাত্র বছরখানেক কাজ করতে পেরেছিলেন। পরে দৈনিক জনকণ্ঠের উন্মেষলগ্ন থেকে যুক্ত হন উপদেষ্টা সম্পাদক হিসাবে। বহু বছর সেই দায়িত্ব পালন করেছেন।

দৈনিক বাংলার একটি ঘটনা দিয়েই শুরু করি। বিশ্বনন্দিত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় তখন মৃত্যুশয্যায়, কলকাতার বেলভিউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। একদিন রাতে নিউজ ডেস্কে আড্ডা দিচ্ছি। তোয়াব ভাই এলেন হঠাৎ। বললেন, এই হাসান কী করো?

আমি বললাম, কিছু না তোয়াব ভাই।

তিনি বললেন, জানো তো সত্যজিৎ রায়ের খবর? এক কাজ করো। দৈনিক বাংলার পুরোনো ফাইল ঘেঁটে সত্যজিৎ রায়ের খবর বের করো। দেখ, সত্যজিৎ রায় বাংলাদেশে এসেছিলেন স্বাধীনতার পরপর। পল্টন ময়দানে বক্তৃতা করেছিলেন। সেই নিউজ বের করে লেখ। সত্যজিৎ রায় মারা গেলে তো দেশ পত্রিকায় (কলকাতার আনন্দবাজার গ্রুপের সাপ্তাহিক দেশ, সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, এখন তা পাক্ষিক) ঠিকই লিখবা।

আমি তখন দেশ পত্রিকার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ছিলাম। প্রতিমাসে একটি বা দুটি লেখা ছাপা হতো আমার। দেশের সার্কুলেশন তখন বিশ্বব্যাপী ছিল আড়াই লাখের মতো। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। আমি তোয়াব ভাইকে জিজ্ঞেস করি, সত্যজিৎ রায় কোন বছর এসেছিলেন?

তিনি বলেন, ফাইল ঘেঁটে বের কর। চার ছাত্রনেতার (চার খলিফা–নূরে আলম সিদ্দিকী, আ স ম আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, শাজাহান সিরাজ) সঙ্গে ছবি আছে দেখবা।

তথাস্তু। নিচতলায় দৈনিক বাংলার গোডাউনে চলে গেলাম তক্ষুনি। সেখানে পুরোনো কপি বাঁধাই করে রাখা আছে। কোনো পিওনের সহায়তা নিলাম না। ধুলোময়লা উপেক্ষা করে নিজেই ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকলাম। পরিশ্রম বৃথা গেল না। ঈপ্সিত সংখ্যাটি খুঁজে পেলাম। ঠিকই। চার ছাত্রনেতার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের ছবি ছাপানো আছে স্টোরির সঙ্গে। ব্যাক পেজ স্টোরি। সত্যজিৎ রায় বেশ লম্বা ছিলেন। চারজনকে ছাপিয়ে তাঁর উচ্চতা। সেই সূত্র ধরে দৈনিক বাংলার শেষের পাতায় ফিচার লিখলাম। পরদিন বেশ গুরুত্ব সহকারে সেটি ছাপা হলো।

এদেশের সাংবাদিকতায় ফিচারের প্রবর্তন এবং তা পাঠকপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে তোয়াব খানের ভূমিকা অগ্রগণ্য। একথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে। তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান থেকে শুরু, ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে। পরবর্তীকালে তাঁর এই অবদান আরও বহুধাবিস্তৃত, বিকশিত, পাঠকধন্য হয়েছে। নীরস হার্ডনিউজের পাশাপাশি সসি ফিচার পাঠকরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। ফিচার ছবি ছাপার ব্যাপারেও তোয়াব ভাইয়ের আগ্রহ ও অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দৈনিক বাংলা ও দৈনিক জনকণ্ঠে তিনি অনেক নতুন নতুন আইটেমের সংযোজন ঘটিয়েছেন। সেগুলো দারুণ হিটও হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠে আমি কীভাবে যোগ দিয়েছিলাম? সে এক নাটকীয় গল্প। দৈনিক বাংলায় (আদি) কর্মরত ছিলাম একটানা ২১ বছর। ১৯৯৭ সালে পত্রিকাটি সরকার বন্ধ করে দেয়। বেকার হয়ে পড়লাম। অগত্যা ধরনা দিলাম আমার মেন্টর কবি শামসুর রাহমানের কাছে। তাঁর পরম প্রীতিভাজনদের একজন ছিলাম আমি। একদিন তিনি সোজা ফোন করলেন তোয়াব ভাইকে। আমার সামনেই। বললেন, তোয়াব সাহেব হাসান হাফিজকে কি আপনার অফিসে নেওয়া যায়? বুঝতে পারলাম অপর প্রান্ত থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। মর্মার্থ হলো নেওয়া যাবে, তবে একটুখানিক সময় লাগবে। দৈনিক জনকণ্ঠ অফিস তখন মতিঝিলের ভাড়া করা একটি বাড়িতে। ইস্কাটনে নতুন অফিস নির্মাণের কাজ তখন শেষ পর্যায়ে। বোধকরি বিলম্বের সেটাই কারণ ছিল। মতিঝিল অফিসে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। কারণ, স্টাফের সংখ্যা দিনদিনই বেড়ে চলেছিল সে সময়টাতে।

কবি শামসুর রাহমান আমাকে বললেন, তুমি প্রথম আলোতে যাও। নতুন পত্রিকা। এটি ভালো হবে। আমি বললে মতি (সম্পাদক মতিউর রহমান) আমার কথা রাখবে। প্রথম আলো তখন বেরোবে বেরোবে করছে। আমি সম্মত হইনি এ প্রস্তাবে। আমি সবিনয়ে কবিকে জানালাম, আমার যে টেম্পেরামেন্ট, সেটা তোয়াব ভাইয়ের সঙ্গে ভালো মিশ খাবে। আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। অন্যত্র যেতে আমি ইচ্ছুক না। দিন যায়। সময় গড়ায়। দৈনিক জনকণ্ঠ থেকে ডাক আর আসে না। আমি কিঞ্চিৎ অস্থির হয়ে পড়ি। মরিয়া হয়ে একদিন কবিকে বলেই ফেলি, তোয়াব ভাইকে প্লিজ ফোন করুন। আর ওনার বাসায় চলুন। কবি তখন বাংলা একাডেমির সভাপতি। একাডেমি থেকে তাঁকে গাড়ি দিয়েছে মাত্র কয়েকদিন হলো। সেই গাড়িতে করেই দুজন গেলাম তোয়াব ভাইয়ের কলাবাগানের বাসায়। সকালবেলা। তোয়াব ভাই নিত্যদিন সকালে রিপোর্টারদের নিয়ে মিটিং করেন। মিটিং করতে না পারলে তাঁর মাথা ঠিকঠাক থাকে না। শামসুর রাহমানের মতো ব্যক্তিত্ব বাড়িতে পদধূলি দিতে আসছেন, আসতে না বলেন কী করে! কিছুটা রাগও করলেন। কবিকে বললেন, এত কষ্ট করে আপনার আসার দরকার ছিল না। ফোনে বললেই হতো। আমরা তিনজন নামলাম চারতলা থেকে। তোয়াব ভাই যাবেন অফিসে। আমরা ফিরে আসব কবির শ্যামলীর বাড়িতে। গাড়িতে ওঠার আগে তোয়াব ভাই আমাকে একটু ধমকেই বললেন, এই তুমি একটা সিভি আমার অফিসে নিয়ে এসো। আমিই যে কবিকে এখানে নিয়ে এসেছি, ওনার মিটিংয়ের দেরি হয়ে গেছে, সে কারণে–তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। সেজন্যই আমাকে মৃদু বকুনি দেওয়া। পরে কবিকে জিজ্ঞেস করেছি, তোয়াব ভাইয়ের বাসায় আর কখনো গিয়েছেন কি? তিনি বললেন, না। এই প্রথম। দীর্ঘকাল তাঁরা দুজন সহকর্মী ছিলেন দৈনিক পাকিস্তানে ও স্বাধীনতার পরে দৈনিক বাংলায়।

যখন দৈনিক জনকণ্ঠে আমার চাকরিটা হয়, প্রথম খবরটা তোয়াব ভাই কবি শামসুর রাহমানকেই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, হাসান হাফিজকে বলবেন আগামীকাল এসে যেন জয়েন করে। ততদিনে দৈনিক জনকণ্ঠ অফিস ইস্কাটনে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। কবি শামসুর রাহমান আমার বাসায় ফোন করে সে খবরটা আমার স্ত্রী শাহীন আখতারকে জানালেন। তখন মোবাইল ফোন চালু হয়েছে। কবির তখন মোবাইল ফোন ছিল না। আমারও না। সুতরাং ল্যান্ড ফোনেই কথাবার্তা হতো সেসময়। শাহীন কবির স্নেহধন্যা, আমাদের বিয়ের আগে থেকেই। শাহীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুখোড় মেধাবী ছাত্রী ছিল। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে কোনো একটি বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে একবার ওর বক্তৃতা শুনে কবি চমৎকৃত, মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেটা আর ভোলেননি।

দৈনিক জনকণ্ঠে আমার যোগদানের ঘটনা ১৯৯৮ সালের অক্টোবরে। তখন দৈনিক জনকণ্ঠের চিফ রিপোর্টার ছিলেন প্রয়াত আবদুল খালেক। দৈনিক বাংলায় আমি তাঁর সহকর্মী ছিলাম দীর্ঘদিন। আমি সবিনয়ে তাঁকে বলি, খালেক ভাই আমি তো আপনার নতুন সৈনিক। একটু পরে রিপোর্টারদের মিটিং শুরু হবে। মিটিংয়ের ব্যাপারে তোয়াব ভাই যে কত সিরিয়াস, সেটা তো আমি আগে থেকেই জানি। কারণ, দৈনিক বাংলায় তিনি সম্পাদক থাকাকালীন মিটিংয়ের মিনিটস আমিই লিখতাম। সেটা কম্পিউটার হয়ে নিউজসংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তার কাছে কপি হিসাবে চলে যেত প্রতিদিন। খালেক ভাইয়ের নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে আমার অবস্থা করুণ। কেমন অসহায় লাগছিল। অগত্যা তোয়াব ভাই-ই ভরসা। এক ফ্লোর ওপরে ওনার কক্ষে চলে গেলাম। গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম চুপ করে। কিছুই বললাম না। বলতে পারলাম না। বলা উচিতও নয়। তোয়াব ভাই তাঁর সহজাত ইনট্যুইশন দিয়ে পরিস্থিতিটা ভালো বুঝতে পারলেন। ইন্টারকম তুলে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এই খালেক। হাসান হাফিজকে নিয়ে মিটিংয়ে আসো। ব্যস। মামলা ডিসমিস। এই হলেন তোয়াব খান। তাঁর সিক্সথ সেন্স ছিল অতীব প্রখর।

দৈনিক জনকণ্ঠে সিনিয়র রিপোর্টার হিসাবে নিয়োগপত্র পেলাম বেশ কয়েকদিন পর। পাওয়ামাত্র তোয়াব ভাইয়ের রুমে গেলাম। কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, আজ আমি নিয়োগপত্র পেলাম। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। উত্তরে তিনি যা বললেন, আমি তা শুনে স্তম্ভিত। তিনি বললেন, কৃতজ্ঞতার কিছু নেই। তুমি অনেক ঘুরেছ।

দৈনিক জনকণ্ঠ ছেড়ে আমি বৈশাখী টিভিতে নিউজ এডিটর পদে যোগ দিই ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তোয়াব ভাই আমাকে ছাড়তে চাননি।

তোয়াব ভাইয়ের একমাত্র বইটির নাম 'আজ এবং ফিরে দেখা কাল'। সময় প্রকাশন থেকে বইটি বের হয়েছে। এডিশন হয়েছে দুটো। দুদফায়ই আমার প্রত্যক্ষ যুক্ততা ছিল প্রোডাকশন দেখভাল করার। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার। দ্বিতীয় সংস্করণ যখন বেরোয়, তোয়াব ভাইকে বললাম, এক কাজ করেন না কেন। আনিস স্যারকে (জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান) বলুন এই সংস্করণের ভূমিকা লিখে দিতে। তোয়াব ভাইয়ের কল্পনায় এমন কিছু ছিল না। দ্বিধান্বিত কণ্ঠে আমাকে প্রত্যুত্তরে বললেন, আনিস লিখবে আমার বইয়ের ভূমিকা? তোমার কী মনে হয়? আমি দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিই, কেন লিখবেন না? আপনার না ক্লাসমেট? বলেই দেখুন। এখনই স্যারকে ফোন করুন।

অপারেটরকে লাইন দিতে বললেন তোয়াব ভাই। নো রিপ্লাই।

আমি বললাম, আমার মোবাইল থেকে করি। নিশ্চয়ই ধরবেন। কারণ, স্যারের ফোনে আমার নম্বর সেভ করা আছে।

তাই করলাম। স্যার ফোন ধরলেন। ভূমিকা লিখতে রাজি হলেন। লিখেও দিয়েছিলেন সময়মতো। স্যার খুবই সিরিয়াস ও সময়ানুবর্তী ছিলেন সব কাজের ব্যাপারে।

বাংলাবাজারে দফায় দফায় গিয়ে বইটির প্রুফ ও আনুষঙ্গিক কাজ করে দিয়েছি। দুইদিন দৈনিক জনকণ্ঠ অফিসে গিয়ে তোয়াব ভাইকে সৌজন্য কপি পৌঁছে দিয়েছি। আমার নিজের একটি সম্পাদিত বই 'মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ গল্প' তোয়াব ভাইকে উৎসর্গ করেছিলাম ২০০০ সালে। কভার ছিল শিল্পী শাহাবুদ্দিনের করা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিল্পকর্ম। তোয়াব ভাই খুব খুশি হয়েছিলেন। বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিনিধিত্বমূলক। এখন সেটির তৃতীয় সংস্করণের কাজ চলছে।

তোয়াব খান একটি প্রতিষ্ঠান। পথিকৃৎ সাংবাদিক। অগ্রসর চিন্তার অসাম্প্রদায়িক আধুনিক একজন মানুষ। কাজই ছিল যাঁর সর্বক্ষণের ধ্যানজ্ঞান। অনেক সফল ও কৃতী সাংবাদিকের তিনি দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু। অতি অল্প কথায় তাঁর বর্ণাঢ্য বহুমাত্রিক অবদান সম্পর্কে বলা সম্ভব না। মহান আল্লাহ তাঁর আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

লেখক: সিনিয়র সহসভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব
প্রদায়ক সম্পাদক, দৈনিক আমাদের নতুন সময়

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

তোয়াব খানঃ পাঠক ছিল যাঁর প্রাইমারি কনসার্ন

আলী হাবিব

চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক, একাত্তরের কলমযোদ্ধা, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোয়াব খান। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার জগতে তাঁর নাম উচ্চারিত হবে পরম শ্রদ্ধায়।

তাঁর সঙ্গে আমার তিন দশকের স্মৃতি। আমি তাঁর ছায়ায় থেকেছি, ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার গর্বের বিষয়। ১৯৯৩ থেকে ২০০৯ সালের মার্চ পর্যন্ত কাটিয়েছি দৈনিক জনকণ্ঠে, তাঁর স্নেহছায়ায়। ২০০৯ থেকে আমার কর্মক্ষেত্র পরিবর্তিত হলেও তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হইনি আমি। বরং দৈনিক জনকণ্ঠ থেকে চলে আসার পর নৈকট্য আরও বেড়েছে। বঙ্গবন্ধু, আগস্ট, দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা–নানা বিষয়ে লিখিয়েছি তাঁকে দিয়ে। একাধিক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছি। সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনের নানা বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলেছেন। সেসব আলাপচারিতার সংক্ষিপ্ত রূপ এই নিবন্ধটি।

প্রায় ৭০ বছরের পেশাদার জীবনে ৯০ ছুঁইছুঁই বয়সেও ছিলেন সক্রিয়। করোনায় আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত যে কোনো তরুণের সঙ্গে সমান তালে কাজ করতে পারতেন। প্রতিদিন রুটিন মেনে চলতেন। প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। একটুও এদিক-ওদিক হওয়ার জো ছিল না। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণ তাঁর রুটিন করা থাকত। ঘুম থেকে

উঠে ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রায় সব খবরের কাগজ সামনে বিছিয়ে বসতেন। সামনে তখন হয়তো টেলিভিশনের পর্দায় কোনো নিউজ চ্যানেল। রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে টিভি পর্দায় শেষ খবরটি দেখা চাই। নিজের কাগজের অবস্থার খোঁজখবর নেওয়া–এসব তাঁর প্রাত্যহিক রুটিনের অংশ। আর এভাবেই পেশাদারিতে ছয়টি দশক পার করেছেন দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক, একাত্তরের কলমযোদ্ধা, প্রয়াত তোয়াব খান।

যে আদর্শিক চিন্তায় দীক্ষা নিয়েছিলেন কৈশোর উত্তীর্ণকালে, সেই জীবনবোধ থেকে কোনোদিন চ্যুত হননি। চাকরি খুইয়েছেন, লড়াই করেছেন। কিন্তু পা বাড়াননি আপসের পথে। তাই প্রাপ্তি কিংবা অপ্রাপ্তি নিয়ে কোনো হিসাব করতে বসেননি কখনো। এমনকি গায়ে মাখেননি উপেক্ষাও।

১৯৫৫ সালে সাংবাদিক হিসাবে পেশাদারির শুরু। পরে কাজ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সেক্রেটারি হিসাবে। ছিলেন প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও পিআইবির মহাপরিচালকও। আবার ফিরেছেন নিজের কাগজ দৈনিক বাংলায়। সেখান থেকেও চাকরিচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আপস করতে যাননি কোথাও। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান বলতে যা বোঝায়, এর শেষ সলতে ছিলেন তোয়াব খান। যদিও নিজেকে মানিক মিয়া কিংবা জহুর হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে তুলনা করতে একেবারেই নারাজ ছিলেন তিনি। বলতেন, 'তাঁরা যে সাংবাদিকতা করেছেন, এর ধারেকাছেও আমরা নেই।'

অন্যরকম এক জীবন ছিল তাঁর। জীবনবোধটাও তাই ছিল নিতান্তই নির্মোহ। বেড়ে ওঠা সাতক্ষীরায়। জন্মগ্রাম রসুলপুর আলোকিত ও বর্ধিষ্ণু। সেখানেই কেটেছে ছেলেবেলা। ছেলেবেলায় মা যতটা, ততটাই তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করেছেন খালা, প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ও শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. এমআর খানের মা। আর সেই বেড়ে ওঠার পরিবেশ? তোয়াব খানের ভাষায়, 'বাড়িতে বহমান ছিল স্বদেশিকতার উতল হাওয়া। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত আত্মীয়স্বজন।' মওলানা আকরম খাঁ তাঁদের অন্যতম। তিনি মাদ্রাসা গড়েছেন বিকল্প শিক্ষায় গ্রামবাসীকে শিক্ষিত করতে। তাঁর জামাতা রেজ্জাক খান। তিনি ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য–মুজফফর আহমেদ, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গেদের সঙ্গে। তিনিও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন স্থানীয়দের শিক্ষিত করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করতে। খেলাফত আন্দোলনের জন্য জিহাদিদের ট্রেনিং হতো তুরস্কে। যেতে হতো আফগানিস্তান হয়ে। পূর্ববাংলা থেকে সেখানে যাওয়ার ট্রানজিট পয়েন্ট ছিল ওই রসুলপুর গ্রাম। এসব খুব কাছ থেকে দেখা তাঁর। জীবনের সূচনাপর্বের এসবকিছুই সারা জীবন কাজ করেছে চলার পথের প্রেরণা ও অনুঘটক হিসাবে।

তোয়াব খান পড়েছেন সাতক্ষীরার শতাব্দীপ্রাচীন প্রাণনাথ (পিএন) স্কুলে। দেশের এক প্রান্তে হলেও পিএন স্কুল ছিল সময়ের নিরিখে যথার্থ অগ্রসর আর বিশেষ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শিক্ষকরা উজ্জ্বল ছিলেন তাঁর স্মৃতিতে। শৈশব থেকে কৈশোরের উত্তরণপর্বটা তাঁদের জন্যই যে যথাযথ হতে পেরেছে, তা সব সময় স্বীকার করেছেন পরম শ্রদ্ধায়।

দীর্ঘ জীবনে অভিজ্ঞতার ঝুলিটি সমৃদ্ধ হয়েছে নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে। প্রত্যক্ষ করেছেন পঞ্চাশের মন্বন্তর। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ। তখন নিতান্তই শিশু তিনি। বয়স মাত্র ৮। কিন্তু স্মরণ করতে পারতেন সেসব দিন। মনে আছে চারদিকে বুভুক্ষু মানুষের মিছিলের কথা। 'কীসব দুর্বিষহ দিন গেছে! প্রতিদিন মরছে মানুষ। সাতক্ষীরার পাকা রাস্তা দিয়ে লোহার চাকা লাগানো মড়া ফেলার গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ডোমেরা। ঘড়ঘড়ানি আওয়াজ শুনলেই বুঝে যেতাম আরও এক হতভাগ্যের জীবনে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল'–স্মৃতি হাতড়ে এভাবেই উচ্চারণ করেছেন তোয়াব খান।

পাকাপাকিভাবে ঢাকায় চলে আসা **১৯৫১** সালে। ওঠেন মামার বাসায়। কিন্তু বছর না ঘুরতেই ভাষা আন্দোলনে দেশ উত্তাল। মামার বাসাটা আবার পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির আন্ডারগ্রাউন্ড আখড়া। মাঝেমধ্যেই সেখানে ডাকসাইটে নেতারা আসতেন। থাকতেন আত্মগোপন করে। মণি সিংহ, খোকা রায়, নেপাল নাগ, সালাম ভাই ওরফে বীরেন দত্ত–এমনকি আলতাফ আলীও। তাঁদের সঙ্গে দেখা হতো, কথা হতো। ভেতরে ভেতরে একটা পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে যায় যৌবনের চৌকাঠে পা রাখা তোয়াব খানের। বলেছেন, 'বোধহয় এভাবেই অজান্তে হয়ে গেছে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দীক্ষা। বদলে গেছে জীবনের গতিপথও। এভাবে অনেকটা ঘোরের মধ্যে চলে যাওয়া। তাতে ক্রমেই শিকেয় উঠেছে পড়াশোনা। পেয়ে বসেছে বিপ্লবের নেশা।' স্বীকার করেছেন, এই সময়টা তাঁর জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।

পেশাদার সাংবাদিকতা জীবনের শুরু **১৯৫৫** সালে, সংবাদের অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে। কেমন ছিল তখনকার দিনের সংবাদ? তোয়াব খানের ভাষায়, 'সংবাদের তখন একেবারে ভঙ্গুর দশা। আহমেদুল কবীর সাহেব করাচি থেকে এসে হাল ধরলেন। তিনি ছিলেন করাচিতে ডেপুটি চিফ কন্ট্রোলার এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট। ওই চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে তিনি এখানে প্রথম একটি কাঠপেনসিলের ইন্ডাস্ট্রি করলেন। এর নাম ছিল অ্যাসেনশিয়াল ইন্ডাস্ট্রিজ। কোকাকোলা এ দেশে চালু হওয়ার আগে ভিটাকোলা নামে একটি পানীয় বাজারজাত করেছিলেন আহমেদুল কবীর সাহেব। এটাই ছিল তাঁর ব্যবসা। তখন রাজনৈতিক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের ক্ষমতাত্যাগ, যুক্তফ্রন্টের বিজয়, নুরুল আমীনের বিদায়–সব মিলিয়ে অবস্থাটা তখন একটু অন্যরকম। আহমেদুল কবীর সাহেবরা ভাবলেন, কাগজ একটা বের করা যায়। সংবাদ ছিল নুরুল আমীনের কাগজ। আহমেদুল কবীর সাহেবরা ছিলেন তাঁর ভাগিনা। তাঁরা এই কাগজটা বের করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সাংবাদিকদের বেতনে ঘাটতি পড়তে শুরু করল। তখন অনেক নামকরা সাংবাদিক ওখানে কাজ করতেন। কবি হাবীবুর রহমান থেকে শুরু করে রাজ্জাক সাহেব ('কন্যাকুমারী' উপন্যাসের লেখক, পরে দৈনিক বার্তার সম্পাদক), সানাউল্লাহ নূরী–সবাই সংবাদে। রণেশ দাশগুপ্ত তখনও জেলে। তখন সংবাদের রিপোর্টার ছিলেন দুজন। একজন ফয়েজ আহমেদ, অন্যজন আবদুল কুদ্দুস। কুদ্দুস সাহেব বিআইডব্লিউটিএ-এর প্রথমে পিআরও, পরে ডিরেক্টর হয়েছিলেন। অবস্থাটা আরেকটু বলা দরকার। প্রথমে কুদ্দুস সাহেব চলে গেলেন। এরপর ফয়েজ সাহেব। বেতন নেই। প্রতিদিন কাজ বন্ধ হয়। ১৯৫৬ সালের দিকে কে জি মুস্তাফা সাহেবকে আনা হলো। ওদিকে প্রতিদিন বেতনের জন্য ঝগড়া করতে হয়। একসময় তিনিও সংবাদ ছেড়ে চলে গেলেন।'

'বিয়ের পর আলাদা সংসার হলো। হ্যাঁ, সে একদিন গেছে বটে! কষ্টের ভেতর দিয়েই সংসার শুরু। শুরুতে খুবই কষ্ট করতে হয়েছে। মাত্র ২৫০ টাকা বেতন, তাও ঠিক সময়ে হয় না। ভেঙে ভেঙে বেতন দেয়। কাজ করি সংবাদে। বার্তাসম্পাদক। সকালে রিপোর্ট করতে বেরিয়ে যেতাম। অ্যাসেম্বলি কাভার করতাম। এর পেছনেও ছিল আর্থিক কারণ। অ্যাসেম্বলি কাভার করলে অফিস থেকে নগদ ১০ টাকা পাওয়া যেত। সেখান থেকে পয়সা বাঁচানো যেত। অফিসের এক রিপোর্টারের সঙ্গে ভাগাভাগি করে একটা বাসা নিয়ে থাকতাম। তো

“

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান বলতে যা বোঝায়, এর শেষ সলতে ছিলেন তোয়াব খান। তিনি ছিলেন পেশাগত সাংবাদিকতায় শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার ঠিকানা। অগ্রসর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাংবাদিকতাকে ব্রত হিসাবে নিয়েছিলেন তিনি

”

সেই চরম কষ্টের দিনগুলোয়ও নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল। দৈনিক পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার পর সংসারে কিছুটা সচ্ছলতা আসে। একসময় নিজের একটা গাড়িও কিনি।'

তোয়াব খান ১৯৬১ সালে বার্তাসম্পাদক হন সংবাদের। ১৯৬৪ সালে যোগ দেন দৈনিক পাকিস্তানে। ১৯৭২ সালে দৈনিক বাংলার সম্পাদক হন। ওই সময় বাংলাদেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা বিচ্যুতি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে কলাম লেখায়। 'সত্যবাক' নামে দৈনিক বাংলায় শুরু করেন 'সত্যমিথ্যা, মিথ্যাসত্য' শিরোনামে বিশেষ কলাম। এই কলামে উঠে আসে একটি স্বাধীন দেশের আর্থসামাজিক চিত্র।

১৯৭৩-৭৫ সালে তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব। আর ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি এরশাদ ও প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের প্রেস সচিব। ১৯৮০-৮৭ সালে তিনি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা। পালন করেছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালকের দায়িত্বও। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক। তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনী আর আকর্ষক উপস্থাপনায় নিয়মিত প্রচারিত হয়েছে 'পিন্ডির প্রলাপ'। স্বাধীন বাংলা বেতার নিয়ে তাঁর রয়েছে ভালো ও মন্দে মেশানো অনুভূতি।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে একেকটি মাইলফলক রচিত হয়েছে তাঁরই নেতৃত্বে। প্রথম চার রঙা সংবাদপত্র এর মধ্যে একটি। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'সব সময়ই পাঠক আমার প্রাইমারি কনসার্ন। প্রতিবারই আমি তাঁদের নতুন কিছু দিতে চেয়েছি।'

সংবাদপত্রে পুরো পাতা ফ্যাশন আর টেকনোলজির জন্য বরাদ্দের কথা তাঁর আগে আর কেই বা ভেবেছেন! দৈনিক জনকণ্ঠে তিনি সেটাই করেছেন। পাঠককে দিয়েছেন নতুন স্বাদ। এটা একদিকে যেমন পাঠকের কথা মাথায় রেখে, তেমনই সময়ের দাবিকে মেনে। আজ বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির যে রমরমা অবস্থা, এর নেপথ্যে দৈনিক জনকণ্ঠের ফ্যাশন পাতার রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। আর সেই পাতার রূপকার তোয়াব খান।

ব্যক্তিগত জীবনে তোয়াব খান ছিলেন এক সুখী মানুষ। সুখী দাম্পত্যের গুপ্তিমন্ত্রটা কী? জানতে চেয়েছিলাম তাঁর কাছে। ২০১৫ সালের ২৫ এপ্রিল তাঁর জন্মদিনের একদিন পর দৈনিক কালের কণ্ঠে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়। তোয়াব খান বলেছেন, 'শুরু থেকে একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে। কী চাই, সেটা নির্দিষ্ট করে ফেলতে হবে। কী করব, কেন করব, কীভাবে করব–পরিকল্পনা স্পষ্ট থাকতে হবে। তাতে জীবনটা সহজ হয়ে যায়। সবকিছু সহজভাবে নিলে কোনো কিছুই আর কঠিন মনে হয় না। জীবন উপভোগ্য হয়। মনে হয়, ভেসে ভেসেই পেরিয়ে গেল জীবন। তবে আমি ম্যানেজমেন্টটা তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব তাঁর। শুরু থেকেই বেতনকড়ি যা পেয়েছি, তাঁর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছি। বাড়ি পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর। ওখানে আমি কখনো হস্তক্ষেপ করিনি। যে বাড়িতে এখন থাকি, এই বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর। ওখানে আমি কোনোদিন মাথা গলাতে যাইনি।'

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান বলতে যা বোঝায়, এর শেষ সলতে ছিলেন তোয়াব খান। তিনি ছিলেন পেশাগত সাংবাদিকতায় শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার ঠিকানা। অগ্রসর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাংবাদিকতাকে ব্রত হিসাবে নিয়েছিলেন তিনি। তিনি শুধু একজন সাংবাদিক ছিলেন না, বরং ছিলেন সাংবাদিকদের সাংবাদিক। পেশাগত জীবনে সাড়ে ছয় দশক পেরিয়ে নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এক প্রতিষ্ঠান।

তোয়াব খানের জীবনের গল্পগুলো তাঁর মুখ থেকেই শোনা। প্রতিমাসে একাধিকবার যেতাম তাঁর বাড়িতে। তাঁর ওপর সাক্ষাৎকারভিত্তিক একটি প্রামাণ্যের কাজও শুরু করেছিলাম। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ভিডিয়ো ধারণ হয়েছে। এরপর করোনার প্রকোপে কাজ বন্ধ রাখতে হয়। আর এগোনো যায়নি। ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে সর্বশেষ কথা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। ৩০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়ও হাসপাতালের আইসিইউ-এর সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছি। ১ অক্টোবর দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে তিনি পাড়ি জমালেন অনন্তলোকে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'মহানায়ক বা মহামানবদের সঙ্গে কাজে থাকা অবস্থায় তাঁদের বিষয়টা বোঝা যায় না। যখন তাঁর অভাব হয়, তখন বোঝা যায় তাঁর গুরুত্ব।...যখনই ছায়াটা সরে যায়, তখনই অভাবটা বোঝা যায়।'

মাথার ওপর থেকে আশীর্বাদের ছায়াটা সরে গেছে। অভাবটা আমি এবং আমরা বুঝতে পারছি।

লেখক: সহকারী সম্পাদক, কালের কণ্ঠ

যাকে ভয় পেতাম, শ্রদ্ধাও করতাম

শরিফুজ্জামান পিন্টু

পত্রিকার প্রকাশক চৌধুরী নাফিজ সরাফাত ফোন দিয়ে বললেন, বিকালে ইউনাইটেড হাসপাতালে যাবেন। আমাকে সঙ্গে যেতে হবে। কারণটি তিনি আগে বলেননি। তবে আন্দাজ করছিলাম, তিনি হাসপাতালে তোয়াব ভাইকে দেখতে যাবেন।

হাসপাতালে তোয়াব ভাইয়ের কেবিনে গিয়ে কিছুটা বিস্মিত। উনি দৈনিক বাংলার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তোয়াব ভাইকে অফার লেটার দিতে চান। সেখানে আমাদের আরেক সুহৃৎ সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

তোয়াব ভাইকে সম্পাদক হিসাবে পাওয়ার ইচ্ছা আমাদের শুরু থেকেই ছিল। ওনার বাসায় কয়েকবার গিয়েছি, কথা বলেছি। কিন্তু তিনি রাজি হচ্ছিলেন না। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থেকে তিনি অফার লেটার হাতে নিলেন। সেটি নেড়েচেড়ে দেখলেন। এরপর বললেন, ওই চিঠিতে তিনটি বিষয় যুক্ত করতে হবে। তা হলো–মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং স্বাধীন সাংবাদিকতা। এই তিনটি বিষয় লিখে দিলে তিনি ভেবে দেখবেন।

চৌধুরী নাফিজ সরাফাত তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, দৈনিক বাংলার পথচলার পাথেয় এই তিনটি বিষয়। যেহেতু অফার লেটার, সেহেতু এসব বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। তিনি চাইলে এগুলো উল্লেখ করেই বোর্ডের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র দেবেন। পরে এই তিনটি বিষয় লিখে তাঁকে জানানো হয়েছিল।

তোয়াব ভাই সুস্থ হলেন। সম্ভবত ৬ অক্টোবর তিনি বাড্ডায় আর এল স্কয়ারে নিউজবাংলার আগের কার্যালয়ে গেলেন। সবার সঙ্গে পরিচিত হলেন। দৈনিক বাংলার কার্যালয় তখনও প্রস্তুত হয়নি। কার্যালয় কেন দ্রুত প্রস্তুত হচ্ছে না, এ নিয়ে তিনি কিছুটা বিরক্ত ছিলেন। কারণ, তিনি প্রতিদিন আসতে চান, মিটিং করতে চান। করোনার সময়

তাঁকে বুঝিয়ে মিটিং করা থেকে বিরত রাখি। কিছুদিন অনলাইনে মিটিং করি। কিন্তু করোনা শেষে আবার তাঁর অফিসে আসার আগ্রহ চাপে। ভবনের কাজ মোটামুটি শেষ হলো। কিন্তু লিফটের কাজ চলমান।

তোয়াব ভাইয়ের মধ্যে অফিসে বসে কাজ করার আগ্রহ যে কতটা, সেটা তাঁর একদিনের কাণ্ডে বুঝেছিলাম। কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি তেজগাঁওয়ে দৈনিক বাংলার নির্মাণাধীন ভবনে এসে পড়েন। এসে দেখলেন, কাজের অগ্রগতি কেমন। আমাদের সহকর্মীদের কাছে জানতে চাইলেন, কাজ শেষ হতে কতদিন লাগবে প্রভৃতি

ফোন করলে তোয়াব ভাই প্রায়ই বলতেন, 'তোমার লিফট কবে লাগবে? আমি পটল তুললে?' তাঁর কাছে বাস্তবতা তুলে ধরতাম। ধুলাবালির মধ্যে তাঁর আসা যে ঠিক হবে না, সেটি বোঝাতাম। এসব শোনার পর তিনি ছোট্ট করে বলতেন, 'দেখো কত দ্রুত লিফট লাগানো যায়।'

শেষ কয়েক মাসে তোয়াব ভাই প্রায়ই মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলতেন। তাঁর মুখে মারা যাওয়ার কথা শুনে বিষয়টি হেসে উড়িয়ে দিতাম। বলতাম, আপনি একশ বছর বাঁচবেন। এ কথা বলার পর আবার বাস্তব জগতে ফিরে যেতাম, বুঝতে পারছিলাম যে তাঁর ভেতরটা ক্ষয়ে যাচ্ছে। শেষদিকে তোয়াব ভাই মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর মধ্যে মৃত্যুচিন্তা ঢুকেছে। তাঁর বাবাও এমন বয়সে মারা গেছেন, বিষয়টি তিনি বাচ্চু ভাইয়ের (তোয়াব ভাইয়ের ছোটো ভাই) সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

আসলে তোয়াব ভাইয়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ দেশে সাংবাদিকতাজগতের সবচেয়ে শ্রদ্ধার মানুষটির বিদায় হলো। এমন বর্ণাঢ্য জীবন সত্যিই ঈর্ষণীয়। তিনি হয়ে উঠেন এ দেশে সাংবাদিকতার শিক্ষক ও বাতিঘর। সততা, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম করে সাংবাদিকতা পেশায় শ্রদ্ধা অর্জন করা এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

তোয়াব ভাইয়ের ভরাট ও টনটনে গলার সঙ্গে আজীবনের সম্পর্ক। সেই মানুষটি কথা বলতে কষ্ট পান, কাশি চেপে রাখার চেষ্টা করেন–এটা অসহনীয় মনে হতো। শ্রদ্ধেয় এই মানুষটির সঙ্গে অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল। আমি তাঁকে ভয় পেতাম, আবার খুব শ্রদ্ধাও করতাম। শ্রদ্ধাটা এমন যে, প্রথম একটি বই লিখে সেটি উৎসর্গ করেছিলাম তাঁকে।

আসলে তাঁর কারণেই আমার সাংবাদিকতা পেশায় টিকে থাকা। ১৯৯৩ সালের মার্চে দৈনিক জনকণ্ঠ প্রকাশের কয়েক মাস পর তোয়াব ভাই আনুষ্ঠানিকভাবে উপদেষ্টা সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। সেখানে প্রায় সাত মাস বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার হিসাবে কাজ করার পর একদিন প্রধান প্রতিবেদক জানালেন, আমাকে আর অফিসে যেতে হবে না। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার হিসাবে আরেকজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অথচ খণ্ডকালীন এই কাজের আশায় আমি বিনা টাকায় সাত মাস কাজ করেছি। প্রয়াত কবি সৈয়দ হায়দারের সঙ্গে শেয়ার করি ঘটনাটি। সৈয়দ হায়দার বিষয়টি নিয়ে কথা বললেন দৈনিক জনকণ্ঠের সাহিত্য সম্পাদক ও তাঁর বন্ধু নাসির আহমেদের সঙ্গে। নাসির ভাই কথা বললেন তোয়াব ভাইয়ের সঙ্গে। আমার ওপর অন্যায়ের বিষয়টি নাসির ভাই তুলে ধরেন তোয়াব ভাইয়ের কাছে। পরদিন আমাকে ডাকলেন তোয়াব ভাই।

চোখের সামনে সেই দৃশ্য আজও ভেসে ওঠে। একজন নায়ক বসে আছেন। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরা। ভরাট গলায় জানতে চাইলেন, আমার সমস্যার কথা। তাঁর সামনে আমি শুধু বলতে পারলাম, 'আমাকে যদি নাইবা নেবেন, তাহলে সাত মাস বিনা বেতনে তাঁরা কাজ করালেন কেন?' তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন, বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার হিসাবে আরেকজন কাজ শুরু করেছেন। সবকিছু জেনে ও বুঝে তোয়াব ভাই সিদ্ধান্ত দিলেন, দৈনিক জনকণ্ঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজন বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার থাকবে। তবে নতুন পত্রিকা হিসাবে আপাতত একজনের বেতন দুজনকে ভাগ করে দেওয়া হবে। আমরা দুজনই তাঁর সিদ্ধান্ত খুশিমনে মেনে নিই, আরেকজন হলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের এখনকার সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান।

১৯৯৬ সালে লেখাপড়া শেষ করার পর একদিন তোয়াব ভাইয়ের কাছে গিয়ে বললাম, 'মাস দুয়েকের মধ্যে চাকরি ছেড়ে দেব। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার খুঁজে দেব কি না।' তিনি বললেন, 'তা খুঁজে দাও। কিন্তু তুমি থাকো।' জানতে চাইলেন, 'এখন বিসিএস পাশ করলে বেতন কত?' তখন সম্ভবত সাড়ে ১২ হাজার টাকা ছিল। খণ্ডকালীন হিসাবে আমি তখন বেতন পাই পাঁচ হাজার পঞ্চাশ টাকা। বললেন, মাস্টার্সের রেজাল্ট বের হলে আমার বেতন হবে ১৪ হাজার টাকা। তাঁর উৎসাহে সেই যে সাংবাদিকতা পেশায় থেকে গেলাম আর কোথাও চাকরির আবেদন করতে পারিনি। দৈনিক জনকণ্ঠের বেতনভাতা অনিয়মিত হলে একযুগ পর ২০০৫ সালে প্রথম আলোয় যোগ দিই। এরপর দেড় দশক তাঁর কাছ থেকে শারীরিকভাবে দূরে থাকলেও মানসিক নৈকট্য ছিল সব সময়। ২০২০ সালে প্রথম আলো ছেড়ে আবার এলাম তোয়াব ভাইয়ের কাছে। কিন্তু এই যাত্রায় এক বছরের মধ্যে তাঁকে হারালাম। তিনি আমার জীবনের প্রথম সম্পাদক, শেষ সম্পাদক কি না বলতে পারব না। তবে এই পেশায় এত শ্রদ্ধার মানুষ আর নেই, আরও হবে কি না, তাও জানি না।

২০২২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক বাংলার উদ্বোধনী সংখ্যায় সম্পাদক হিসাবে তাঁর লেখা ছাপার সিদ্ধান্ত নিই আমরা। বেশ কয়েকদিন প্রস্তুতি নিয়ে তিনি লিখলেন। কিন্তু সেই লেখার শিরোনাম দিতে চাইলেন একটি কবিতার লাইন। তোয়াব খান শিরোনাম করবেন, আর সেই বিষয়ে কথা বলার স্পর্ধা আমার থাকার কথা না। কিন্তু পত্রিকার উদ্বোধনী সংখ্যা বলে কথা। আমি বাসায় গিয়ে তাঁকে খুবই বিনয়ের সঙ্গে বললাম, এই শিরোনামে আপনি আরেকটি লেখা লেখেন। কিন্তু উদ্বোধনী সংখ্যার লেখার প্রতিটি শব্দ ঠিক থাকলেও কেবল শিরোনামটি পরিবর্তন করে দেন। কারণ সম্পাদক হিসাবে আপনাকেই বলতে হবে কেন দৈনিক বাংলা ফিরে এসেছে, কীভাবে পথ চলবে দৈনিক বাংলা।

কিন্তু আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। শিরোনাম বদলাতে তোয়াব ভাই রাজি হলেন না। তাঁর পিএস গিরীশ গৈরিককে দায়িত্ব দিই তোয়াব ভাইকে বোঝানোর জন্য। গিরীশ এসে বললেন, তিনি শিরোনাম বদলাতে রাজি নন। এরপর বাচ্চু ভাইকে অনুরোধ করি তিনি যেন তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে শিরোনাম বদলের অনুমতি নিয়ে দেন। বাচ্চু ভাইও ব্যর্থ হলেন।

পত্রিকার উদ্বোধনী সংখ্যা প্রকাশের দিন এগিয়ে আসতে থাকে। ৩ সেপ্টেম্বর পত্রিকার প্রকাশক চৌধুরী নাফিজ সরাফাতকে জানাই বিষয়টি। তিনি তোয়াব ভাইকে এ বিষয়ে কিছু বলতে রাজি নন। বললেন, এটা আপনাদের গুরু-শিষ্যের ব্যাপার। অফিসের সবাই শিরোনামের বিষয়টি নিয়ে ফিসফাস করেন। কিন্তু তাঁকে কিছু বলার সাহস কারও নেই।

৩ সেপ্টেম্বর সকালে পত্রিকার উদ্বোধনী সংখ্যা প্রেসে পাঠানোর আগে সাহস করে ফোন দিই তোয়াব ভাইকে। প্রেসে পাঠানোর আগে দোয়া চাইলাম তাঁর কাছে। বললাম, অনেক চাপের মধ্যে আছি তোয়াব ভাই। আপনার অনুমতি ছাড়া শিরোনাম বদলাতে পারব না। তিনি বললেন, 'শিরোনাম কী করতে চাও?' বললাম, সহজ কথায়–'আবার এসেছি ফিরে'। তিনি পুরোপুরি একমত নন। এর মধ্যে তাঁর কাশি হচ্ছিল। আমি ফোন রাখলাম। আবার ফোন করি বাচ্চু ভাইকে। বাচ্চু ভাই এবার বললেন, 'তিনি কিছুটা নরম হয়েছেন। শিরোনাম বদল করতে পারি।'

৩ সেপ্টেম্বর প্রেসে খটখট করে বিকট শব্দে ছাপা হচ্ছে দৈনিক বাংলার উদ্বোধনী সংখ্যা, তখন বুকটা যেন দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল। সাংবাদিকতায় শিক্ষাগুরু হিসাবে যাকে মেনে এসেছি, তাঁর নির্দেশ মানতে পারিনি। পরদিন তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলাম। তিনি মুচকি হাসলেন, ক্ষমা করে দিলেন মনে হয়।

হাসপাতালের হিমঘরে তোয়াব ভাইয়ের মরদেহ রেখে তেজগাঁওয়ে দৈনিক বাংলার কার্যালয়ে এলাম। আমাদের প্রত্যাশা ছিল, এই ভবনে আর কদিন পরই তিনি আসবেন। লিফটের দিকে তাকালাম, কাজ চলছে। কিন্তু যে মানুষটির জন্য তাড়াতাড়ি লিফট লাগানো হচ্ছে, তিনি আর এতে উঠবেন না।

লেখক: ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক বাংলা

আমরা অভিভাবকশূন্য হয়ে গেলাম

মোবাশ্বেরা খানম বুশরা

তোয়াব খানের সঙ্গে প্রথম দর্শনেই তাঁর সাংবাদিক পরিচয়টি আমাকে রোমাঞ্চিত করেছিল। কারণ, সেই বাল্যকালে এ শব্দটির প্রতি কেমন যেন অপ্রতিরোধ্য একটি আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। তোয়াব খানকে তাই মনে হতো স্বপ্নপুরুষ। মনে করতাম, রহস্যময় এক জগতের বাসিন্দা তাঁরা–সব জানেন, সব খবর রাখেন, দুনিয়াটা তাঁদের হাতের মুঠোয়। তাই একসময় স্বপ্নও দেখতাম সাংবাদিক হওয়ার।

তোয়াব ভাই সম্পর্কে আমার দুলাভাই। সেই ১৯৬৬-৬৭ সালে টেলিভিশনে আলোচনা অনুষ্ঠানে তোয়াব ভাইকে দেখে গর্বে মনটা ভরে যেত। টেলিভিশনে দেখা যায়, এমন মানুষ আমাদের এত চেনা (তার শ্বশুরবাড়ি, পরে যেটা আমারও শ্বশুরবাড়ি হয়, আমার বাবার বাড়ির পাশেই ছিল)। হয়তো আমার সেই বালিকা বয়সে দুলাভাই আমাকে লক্ষই করেননি, করার কথাও নয়। এর ওপর গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্ব, অন্তর্মুখী স্বভাব, কর্মনিষ্ঠ ব্যস্ততা তাঁকে যেন সব সময় সংসারের ভেতরেই একটি দূরত্বের আড়াল তুলে সংসারবিবাগি করে রাখত। দিনে দিনে এই পরিবারের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের সূত্রে পরিবারের একজন হয়ে তাঁকে একটু একটু করে জানতে পারলাম। বুঝলাম যতটা ভয় পাই, ততটা ভয়ের তিনি নন। তাঁর আপাত গম্ভীর, উদাসীন স্বভাবটি আসল নয়, ওটি একটি খোলসমাত্র, সেই কঠিনের একেবারে নিভৃতে খুবই স্নেহশীল ও ভালোবাসাময় একটি প্রাণ আছে। তাঁর সে ভালোবাসা নীরব হলেও কতটা

অতলস্পর্শী, সেটা তাঁর কাছাকাছি যাঁরা গেছেন, সবাই উপলব্ধি করেছেন।

মনে ভাসছে কত টুকরো টুকরো স্মৃতি। দুলাভাই স্বল্পবাক মানুষ; কিন্তু কখনো কখনো মনের দরজাটা খুলে দিতেন। শুনিয়েছিলেন সংবাদে কাজ করার সময় কীভাবে দিনের পর দিন বেতন ছাড়া চলতে হয়েছে, বিয়ের সময় কী করে টাকা জোগাড় করেছিলেন। অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম তাঁর সংসার শুরুর সংকটময় দিনগুলোর কথা শুনে।

নিভৃতচারী এই মানুষটি তাঁর বাইরের জগতে যেমন, তেমনই ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনেও। এমনই নিজেকে অনুচ্চারিত রেখে সবার জন্য লালন করতেন গভীর মমতা। কয় দিন না গেলেই অনুযোগ করতেন, 'তোমরা যে আর আস না!' সব সময় চাইতেন আমরা যেন ঘন ঘন তাঁর বাসায় যাই এবং তাঁকে ঘিরে আড্ডা দিই। দুলাভাই খুব উপভোগ করতেন এসব আড্ডা। তবে একটি আক্ষেপ আমার রয়ে গেল, সেটি তাঁকেও বারবার বলেছি, তা হলো; তাঁর এই বিশাল অভিজ্ঞতার ঝুলিটি তিনি নিজের লেখায় উপুড় করে দিলেন না। অনেক সাংবাদিক, কলামিস্ট তিনি তৈরি করেছেন, যত্ন করে তাঁদের কাজ শিখিয়েছেন; কিন্তু নিজে তেমন লেখেননি। অথচ এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্যই হয়তো তাঁর কলমে উঠে আসতে পারত, হতে পারত মূল্যবান দলিল। শেষদিকে আমার এবং তাঁর আরও কজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর কথায় হয়তো একটি উপলব্ধি এসেছিল, চেয়েছিলেনও; কিন্তু তখন শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। যদিও স্মৃতিশক্তি তেমনই প্রখর ছিল।

দুলাভাই বই পড়তে ভালোবাসতেন বলে তাঁকে বই উপহার দিতাম। কী যে খুশি হতেন। বইটা হাতে নিয়েই বলতেন, 'তোমাদের গিফটটা সবচেয়ে ভালো।' একবার দিয়েছিলাম অশোক মিত্রের 'আপিলা-চাপিলা', আরেকবার তপন রায় চৌধুরীর 'বাঙ্গালনামা'। কী যে পছন্দ করেছিলেন।

জীবনের অনিবার্য সত্যের মতো আমাদের পরিবারেও মৃত্যু বারবার এসেছে। তবে সবচেয়ে করুণ আর মর্মান্তিক ছিল দুলাভাইয়ের ছোটো মেয়ে এষার অকালমৃত্যু। ফুলের মতো ফুটফুটে সুন্দর এষা মাত্র সাতাশ বছর বয়সে মারা যায়। এমন এক অসুখে যার কোনো চিকিৎসা তখনও বের হয়নি। সেসময় দেখেছি কী অসীম ধৈর্য নিয়ে সেই মৃত্যুকেও সহ্য করেছেন। অথচ এই মেয়ে ছিল তাঁর চোখের মণি। অন্তর্মুখী মানুষটা তখনও দৈনিক জনকণ্ঠ এবং তাঁর কাজকে আঁকড়ে ধরে সান্ত্বনা খুঁজেছেন। কাজ ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান, আশ্রয়। কন্যাবিয়োগের দুদিন পরই দৈনিক জনকণ্ঠ অফিসে গেছেন। কাজের ভেতরে ডুবে থেকে ভুলতে চেয়েছেন হৃদয়ের রক্তক্ষরণকে। সেসময়ও তিনি চাইতেন আমরা যেন সব সময় যাই, তাঁকে ঘিরে থাকি। বারবার এসে বসতেন আমাদের সঙ্গে। চুপচাপ বসে থাকতেন। হয়তো অব্যক্ত শোকে দীর্ণ হৃদয়কে সবার উপস্থিতি দিয়ে ভোলাতে চাইতেন। হৃদয়ের সেই রক্তপাত আজীবন নীরবে বহন করেছেন। নিজের শেষশয্যায় এষার নামটিই অস্ফুটে উচ্চারণ করেছেন বারবার।

পেশাগত জীবনে অনেক দায়িত্ব পালন করেছেন, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে যখন যোগ দিয়েছিলেন, তখন প্রথমে তাঁর পরিবার যেতে পারেনি। এষার বয়স দুই বছর, তানিও ছোটো। তাদের রেখে অনিশ্চিত যাত্রায় রওয়ানা হয়েছিলেন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিয়েছিলেন। 'পিন্ডির প্রলাপ' নামে নিয়মিত কথিকা পড়েছিলেন, জড়িত হয়েছিলেন একটি রাষ্ট্রের জন্ম প্রক্রিয়ার সঙ্গে।

কখনোই লক্ষ্যচ্যুত হননি। প্রলুব্ধ হয়ে বিস্মৃত হননি তাঁর অন্তর্গত আদর্শকে, যা বাংলাদেশের কথা বলে, প্রান্তিক মানুষের কথা বলে, অসাম্প্রদায়িক উদার এক রাষ্ট্রের কথা বলে, বঙ্গবন্ধুর কথা বলে। নীতিতে অবিচল থাকতে গিয়ে কখনো আপস করেননি। একবার জেলেও গেছেন দৈনিক জনকণ্ঠে একটি সংবাদ প্রকাশের জন্য। আমরা ভয়ে অস্থির হয়েছি; কিন্তু দুলাভাই ছিলেন অবিচল। কর্মমগ্ন, জীবনলগ্ন এই মানুষটি আমাদের পরিবারের অভিভাবক ছিলেন সাংসারিক ও নৈতিক সর্বার্থেই। তাঁর চলে যাওয়া আমাদের শূন্যতার এক ধু-ধু প্রান্তরে ঠেলে দিল।

লেখক: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক

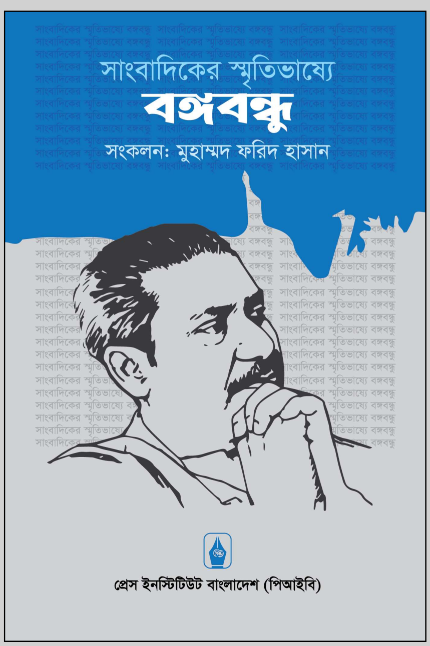

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

তোয়াব খান কঠিনে কোমল

শমশের সৈয়দ

তোয়াব ভাইকে আমি শুরুতে খুবই ভয় পেতাম! যাকে বলে একেবারে বাঘের মতো! কোনো কাজে তাঁর কাছে গেলে অথবা হঠাৎ তিনি আমার সামনে পড়ে গেলে ভয়ে মুহূর্তে আমার মুখ শুকিয়ে গলা ধরে আসত! অকারণেই হাত-পা কাঁপত! গা শিরশির করে হিম হয়ে আসবার মতো অবস্থা হতো! আর একই সঙ্গে আমার কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে যেত!

অর্থাৎ আমি তাঁকে যা বলতে চাইতাম, শেষমেশ তা আর বলা হতো না! তৎক্ষণাৎ আধা উলটা আধা সিধা মিলিয়ে জগাখিচুড়ি মার্কা কিছু একটা বলে কঠিন ধমক খেয়ে মাথা নিচু করে চলে আসতাম। আসলে আমার মধ্যে এমনটা কেন হতো আমি নিজেই ঠিক জানতাম না!

সুন্দর সৌম্য আকর্ষণীয় তোয়াব ভাইয়ের স্মার্টনেস, রাশভারী চেহারা, জলদগম্ভীর কণ্ঠ আমাকে সহসা ভড়কে দিত। তিনি ফোন করলে অথবা ডাকলেই মনে হতো, না জানি কাজে কী ভুল হয়েছে! এই বুঝি হুংকার দেবেন, এখনই ভেসে আসবে তাঁর কণ্ঠ থেকে বাঘের মতো গর্জন! আসলে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রথমদিকে এমনটাই কেটেছে আমার বেশ কয়েক বছর।

পরবর্তীকালে একটা সময় এলো। আমার 'আন-অফিশিয়াল' কিছু দায়িত্বও বাড়ল। ক্রমে আমরা কাছাকাছি হতে থাকলাম। প্রথম প্রথম শুধু ইন্টারকম, সেলফোন ও টেলিফোনে যোগাযোগ হতো। এরপর ধীরে ধীরে আমরা পরস্পর সামনাসামনি হতে শুরু করলাম।

কাজের প্রয়োজনে প্রতিদিন তাঁর সান্নিধ্য পেতে থাকি। এভাবে তাঁকে ঘিরে আমি ক্রমশ পড়ে গেলাম অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে। এ অবস্থায় ভয় কেটে গিয়ে তাঁকে আমার ভালো লাগা শুরু করল। মনের মধ্যে ইচ্ছা জাগতে লাগল প্রতিদিন যেন সামান্য হলেও তাঁর সাহচর্য পাই। বুঝতে পারলাম ক্রমশ তিনিও আমাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, স্নেহ করছেন, মন দিয়ে আমার কথা শুনছেন, আমাকে গুরুত্বও দিচ্ছেন...।

ফলে আমাদের সম্পর্ক এতটাই নিবিড় হয়ে পড়ল যে একপর্যায়ে দ্বিধান্বিত চিত্তে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে একদিন বলেই ফেললাম, ভাই, ফেসবুকে আপনাকে রিকোয়েস্ট পাঠাতে চাই!

আনত মস্তকে গভীর মনোনিবেশে কর্মরত তোয়াব খান ধীরে ধীরে আমার চোখে চোখ রাখলেন। গম্ভীর দৃষ্টি! ভয়ে আমি ভড়কে গেলাম! কিছুক্ষণ পর আমাকে চমকে দিয়ে ঢিমেতালে বললেন, দাও! পরদিনই আমরা পরস্পর ফেসবুকে যুক্ত হয়ে গেলাম! এভাবে আমি যতই তাঁকে কাছ থেকে দেখি, ততই মুগ্ধ হই! আমার ঘোর যেন আর কাটে না!

নিউজ ডেস্কে প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে অন্তত রাত ২টা পর্যন্ত ডিউটি। অদ্ভুত ব্যাপার! যখনই তাঁকে প্রয়োজন হতো, তখনই হাজির! ওপাশ থেকে রিসিভারে কণ্ঠ ভেসে আসত–'বলো...'। কাজের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই সমস্যার সমাধান দিয়ে তখনই ভবিষ্যতে পুনরায় এমন হলে কী করতে হবে, সেই পরামর্শও দিয়ে দিতেন।

এত গভীর রাতে ফোন দিয়েছি বলে কখনো এতটুকু বিরক্ত হতেন না। তাঁর চরিত্রের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে আমাকে আমার কাজের প্রতি আরও বেশি অনুপ্রাণিত করতে থাকল।

এমনইভাবে তোয়াব ভাইয়ের কাছ থেকে সাংবাদিকতার খুঁটিনাটি কতকিছু যে শিখেছি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তোয়াব ভাইয়ের একদম কাছাকাছি থেকে কাজ করতে গিয়ে দিনে দিনে এটুকু উপলব্ধি হয়েছে যে, আমি যে মানুষটাকে এতদিন বাঘের মতো ভয় পেতাম, সেই মানুষটি আদতে ততটা ভয়ংকর কেউ নন, বরং বেশ কোমল এবং নিজ চোখে দেখা অনেকের চেয়ে অনেক উঁচু মনের মানুষ তিনি। তাঁর অবস্থান আমার কাছে অন্যদের চেয়ে আলাদা। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে লক্ষ করেছি, চালচলনে তাঁকে বাহ্যত চরম কঠিন মনে হলেও হৃদয়ের গভীরে ছিল যথেষ্ট মমতা, কোমলতা।

বাইরের গাম্ভীর্য, রাশভারী আচরণ এবং তাঁর ভয়াবহ ধমকের মধ্যেও যেন আলতোভাবে মিশে থাকত অস্ফুট স্নেহ আর ভালোবাসার আবরণ। বস্তুত একধরনের বিরল বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন বলেই বোধকরি সবাই তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা-সম্মান করতেন, তেমনই সমীহ করে চলতেন।

একজন কাজপাগল পেশাজীবী সম্পাদক এবং নিবেদিতপ্রাণ সংবাদকর্মী হিসাবে একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা শব্দসৈনিক তোয়াব খান একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাংবাদিক। তাই তোয়াব খানের মহাপ্রয়াণ দেশের জন্য, সাংবাদিকতার জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। এ দেশে সাংবাদিকতায় প্রবাদপ্রতিম এই মহান মানুষটির সঙ্গে সেই ১৯৯৫ থেকে দীর্ঘ ২৬ বছরের বেশি সময় কাজ করতে পেরে আমি সবিশেষ গর্বিত। আমার কাছে তাঁর মৃত্যু নেই...!

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, দৈনিক জনকণ্ঠ

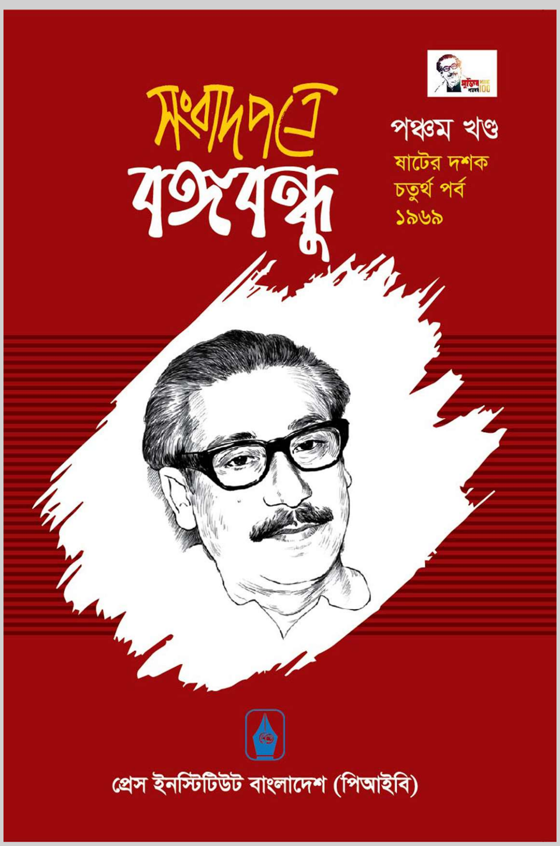

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

‘এই আলীম তোমার জেলায় কি যুদ্ধ হয়নি? রাজাকার নেই?’

মীর আব্দুল আলীম

অসাম্প্রদায়িক, ত্রিকালদর্শী এক স্বপ্নিল মানুষ ছিলেন তোয়াব খান। তিনি আমার গুরু। ৩০ বছর দৈনিক জনকণ্ঠে কাজ করার সুবাদে সাংবাদিকতা আর লিখতে শিখেছি ওনার কাছ থেকেই। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। ভুল হলে ধমক দিতেন। ২০১০ সালের অক্টোবরের কোনো একদিনে দৈনিক জনকণ্ঠ থেকে আমার মোবাইলে কল এলো। তোয়াব ভাইয়ের কণ্ঠ। তিনি ফোন করলে ভীষণ ভয় পেতাম। শুরুতেই বলছিলেন, ‘এই আলীম তুমি বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখ ঠিক আছে, তবে অমুক পত্রিকায় (পত্রিকার নামটা আমি আজ বলছি না) আজ তোমার কলাম দেখলাম, তোমার সঙ্গে কি এটা যায়?’ পত্রিকাটি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের পত্রিকা নয়। সামসময়িক বিষয় নিয়ে তখন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে আমি কলাম লিখি। ওই পত্রিকাটিতেও সেদিন আমার কলাম ছাপা হয়। ভীষণ রেগেছেন তোয়াব ভাই। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সাংবাদিক হিসাবে বিরোধী একটি পত্রিকায় কলাম লেখাটা তিনি মোটেও ভালো চোখে দেখেননি। আমি ভয়ে ভয়ে বলছিলাম, ‘বিষয়টি আলোচিত ঘটনা, যেহেতু আমি প্রত্যক্ষদর্শী আর রূপগঞ্জের মানুষ, তাই এই পত্রিকার পাঠকও সঠিক ঘটনা জানুক–এজন্য সেখানে লেখা পাঠিয়েছি।’

‘আর কখনো এটা করব না বস’ বলতেই তিনি বললেন, ‘ঠিক আছে লিখে যাও, তোমার জন্য দোয়া রইল।’ আমাকে ভালোবাসতেন বলেই, আমার ক্যারিয়ারের কথা

সময়ানুবর্তিতার কারণেই দৈনিক জনকণ্ঠকে তিনি শীর্ষ পর্যায়ে নিতে পেরেছিলেন। সংবাদ পরিবেশনা ও উপস্থাপনার নিজস্ব ভঙ্গি, যা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির বাংলাদেশে জন্ম হবে কি না, আমার জানা নেই। তিনি সময় ধরে অফিসে আসতেন, রাতে প্রথম সংস্করণ বের করে বাড়িতে যেতেন

ভাবেন বলেই ফোন করে আমাকে পরামর্শ আর ধমক দিয়েছেন সেদিন।

তিনি অনুজ সাংবাদিকদের কতটা ভালোবাসতেন, এর আরেকটা উদাহরণ দিতে হয়। দৈনিক জনকণ্ঠের সাবেক ফটো এডিটর ইয়াছিন কবির জয় ভাইয়ের রুমে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'তোয়াব ভাই আজ মিটিংয়ে আপনার প্রসঙ্গ তুলেছেন।' শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, খারাপ কিছু না তো। মিটিংয়ে রিপোর্টারদের উদ্দেশে তোয়াব ভাই নাকি বলেছিলেন, 'নিউজের জন্য চোখ থাকতে হয়। নিউজ ফিচার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। খুঁজে নিতে হয়। মীর আলীম ছোটো গণ্ডি থেকে কীভাবে এত খবর আর ফিচার বের করে আনে সেটা দেখ।' জয় ভাইয়ের কথা শুনে চোখের কোণে কিছুটা জল এলো। এটা আনন্দাশ্রু। ওনার রুম থেকে বেরিয়ে তোয়ার ভাইয়ের রুমে একটু সালাম দিতে ঢুকব, তাঁকে প্রচণ্ড ভয় পেতাম বলে দিলীপ দেবনাথ দাদাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। কেন এসেছ আলীম? তখন দৈনিক জনকণ্ঠ শীর্ষ পত্রিকা। বিভিন্ন বিভাগ থেকে পত্রিকার সংস্করণ বের হয়। সার্কুলেশনে ধারে-কাছেও নেই অন্য পত্রিকা। শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী যেন পাঠকের কাছে হটকেক। জানালাম, সাময়িকী পাতায় পাটের অদ্যোপান্ত নিয়ে লিখতে চাই। বললেন, পারবা? অভয় আর আপনার দোয়া থাকলে অবশ্যই পারব। গবেষণাধর্মী লেখা। সময় লেগেছে প্রায় ছয় মাস। পূর্ণ এক পাতারও বেশি লেখাটি হাতে লিখে জমা দিলাম। দুদিন বাদেই শুক্রবার লেখাটি ছাপা হলো। এত দ্রুত সিরিয়াল পাব ভাবিনি। তিনি এই লেখা প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'তুমি একদিন থাকবা না; কিন্তু তোমার এ লেখা থেকে যাবে এদেশের কোনো গবেষণাগারে।' তিন বছর পর তোয়াব ভাইয়ের এ কথার সত্যতা পেয়েছিলাম। আমার চাচা ড. মীর রফিকুল ইসলাম তখন বাংলাদেশ পলিটেকনিক ইনিস্টটিউটের প্রিন্সিপাল। আমি ওনার অফিসে গিয়েছিলাম কোনো একটা কাজে। এক ফাঁকে তিনি তাঁর পিওনকে দিয়ে একটি ফাইল আনালেন। ফাইলটি আমার সামনে দিয়ে আমার পাট নিয়ে লেখাটি দেখালেন। ওনারা এটা সংরক্ষণ করেছেন। গর্বিত হলাম। তোয়াব ভাইয়ের কথা একদম কাঁটায় কাঁটায় মিল পেলাম।

দৈনিক জনকণ্ঠের আরেকটি ফিচার পাতা 'টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া' রোববার বের হতো। 'বাঙ্গির চর' শিরোনামে আর্ধপাতারও বেশি একটি লেখা কালার ছবি দিয়ে ছাপা হয়েছে। এ লেখাটি লিখতে গিয়ে কুমিল্লার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনদিন আমাকে থাকতে হয়েছে। বাঙ্গির আদ্যোপান্ত তুলে এনেছি এই লেখায়। সেদিন রূপগঞ্জের একটি নিউজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য না থাকায় বেশ জোরেশোরেই ধমক দিলেন তোয়াব ভাই। ফোন রাখার আগে বললেন, টেকনাফের পাতায় বাঙ্গি নিয়ে তোমার লেখাটা ভালো হয়েছে। আদর-শাসন দুটিই করতেন তিনি। ওনার এমন শাসন আর দিকনির্দেশনার ফলেই কিছুটা লিখতে শিখেছি।

তিনি আজ নেই। খুব মনে পরে তাঁকে। তাঁর কথা ভাবতেই চোখে জল আসে। আমি ধন্য যে তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। আরেকটি প্রসঙ্গ সামনে আনতে হয়। দৈনিক জনকণ্ঠ ভবনেই সারা দেশের প্রতিনিধি সম্মেলন। শ্রদ্ধাভাজন সম্পাদকের পাশেই বসা ছিলেন তিনি। অনুষ্ঠান চলছে। সন্ধ্যা হতেই মঞ্চ ত্যাগ করছিলেন তোয়াব ভাই। আমাদের সবার প্রিয় সম্পাদক তখন তাঁকে আরেকটু সময় দিতে অনুরোধ করলেন। পত্রিকার কাজ পড়ে আছে–এই বলে মঞ্চ থেকে বের হয়ে গেলেন। সময়ানুবর্তিতার কারণেই দৈনিক জনকণ্ঠকে তিনি শীর্ষ পর্যায়ে নিতে পেরেছিলেন। সংবাদ পরিবেশনা ও উপস্থাপনার নিজস্ব ভঙ্গি, যা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির বাংলাদেশে জন্ম হবে কি না, আমার জানা নেই। তিনি সময় ধরে অফিসে আসতেন, রাতে প্রথম সংস্করণ বের করে বাড়িতে যেতেন। বাড়িতে গিয়েও কোন খবরে কী পরিমার্জন আনতে হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। প্রতিবেদন তৈরি থেকে সম্পাদনার কাজ তিনি কনিষ্ঠ সহকর্মীদের হাতেকলমে শিখিয়েছেন। তিনি ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ এবং একজন অসাম্প্রদায়িক বাঙালি।

মনে পরে দৈনিক জনকণ্ঠের ধারাবাহিক 'সেই রাজাকার' যখন ছাপা হতো, তখন একদিন তিনি ফোনে বলছিলেন, 'এই আলীম তোমার জেলায় কি যুদ্ধ হয়নি? রাজাকার নেই?' তিনি আমার কাছ থেকে লেখা প্রত্যাশা করছিলেন। বললাম, 'আছে বস। তৈরি করছি। আজকালের মধ্যেই পাঠাব।' সবকিছুতে নজর থাকত তোয়াব ভাইয়ের। নব্বইয়ের দশকে তাঁর পৌরোহিত্যে যখন দৈনিক জনকণ্ঠ প্রকাশিত হয়, শুরুতে অফিস ছিল মতিঝিলে। তখন আমি আজকের কাগজে। আজকের কাগজ ছেড়ে চলে এলাম দৈনিক জনকণ্ঠে। তখন আজকের কাগজ না ছাড়লে হয়তো তোয়াব ভাইয়ের ছোঁয়া, ভালোবাসা কোনোটাই পেতাম না। অনেক কিছুই শেখার বাকি থেকে যেত। আমরা যারা দৈনিক জনকণ্ঠে ছিলাম, আমাদের লেখনীর মানোন্নয়নে তিনি পত্রিকাটির উপদেষ্টা সম্পাদক হিসাবে রাখেন প্রভূত ভূমিকা।

সদর্থক অর্থেই তিনি ছিলেন একজন কিংবদন্তি সাংবাদিক। সাংবাদিকতার বটবৃক্ষ। তিনি আজ নেই, এটা ভাবতেই যেন কেমন লাগে। ৮৭ বছরের আয়ুষ্কালে প্রায় ৭০ বছরই যুক্ত ছিলেন এ পেশায়। এমনকি যখন তিনি বিদায় নিলেন, তখনও সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন দৈনিক বাংলা পত্রিকার। বয়স তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েই কাজ করছিলেন মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত। সেই অর্থে তাঁর বিদায় ঈর্ষণীয় গৌরবের।

লেখক : দৈনিক জনকণ্ঠের রূপগঞ্জ প্রতিনিধি

সত্তর সালেই 'দৈনিক পাকিস্তান' কার্যত 'দৈনিক বাংলাদেশ' হয়ে যায় ——— তোয়াব খান

এই সাক্ষাৎকারটি ২০২০ সালের মার্চে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) থেকে অনুদানপ্রাপ্ত 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণার জন্য নেওয়া হয়। জনকণ্ঠ ভবনে বসে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক **রাহাত মিনহাজ**।

মিনহাজ: ১৯৭১ সালে আপনি 'দৈনিক পাকিস্তান' সংবাদপত্রের বার্তা সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। পত্রিকাটি তখন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ছাপা হতো, ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের অধীনে ছিল। মার্চের শুরুর দিকে বাংলাদেশের স্বাধিকার বা অসহযোগ আন্দোলনের প্রশ্নে এই সংবাদপত্রটির অবস্থান বা ভূমিকা কেমন ছিল?
তোয়াব খান: ১৯৭১ সালের মার্চের গণ-আন্দোলনের শুরুতে 'দৈনিক পাকিস্তান' কার্যত 'দৈনিক বাংলাদেশ'-এ পরিণত হয়েছিল। ওই সময়ে পত্রিকাটিতে দুটি বিষয়ের সমন্বয় ছিল। একটা হচ্ছে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সংবাদ প্রকাশ। কারণ, এটা না করলে কাগজ টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের সময় ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একই

ভবনে অবস্থান হওয়ায় সেসময় দৈনিক পাকিস্তানও পুড়ে গিয়েছিল। সুতরাং দৈনিক পাকিস্তানে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁরা কোনো অবস্থায়ই চাইতেন না, কাগজটার ভূমিকা যাতে জনবিরোধী হয়। কারণ জনবিরোধী সংবাদ ছাপা হলে জনগণ আবারও অফিসটি পুড়িয়ে দিতে পারে। এজন্য ১৯৬৯-এর পর থেকে পত্রিকাটিতে ক্রমান্বয়ে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। যেমন: ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটা ধারাবাহিক স্টোরি ছাপা হয়েছিল। এটা প্রায় টানা দেড় মাস ছাপা হয়েছিল। সম্ভবত 'এ দেশেই জন্ম আমার...' শিরোনামে ছাপা হয়েছিল। ফজলে লোহানী সাহেব ছিলেন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, খুবই গুণী মানুষ। তিনি এই ধারাবাহিকটি লিখেছিলেন। ধীরে ধীরে দৈনিক পাকিস্তানের ওপর প্রেস ট্রাস্টের খবরদারি কমতে থাকে। বরং মানুষের চাহিদার প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা ছিল।

১৯৭১-এর মার্চের আন্দোলন শুরুর পর ঢাকা থেকে সংবাদপত্র অন্যান্য জেলা শহরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ ট্রেন, বাস, প্লেন চলাচল বন্ধ ছিল। ঢাকার আশপাশে মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর–এসব অঞ্চলে পত্রিকা যেত। তখনকার মানুষের যা যা চাহিদা এবং আন্দোলনের যেসব কর্মসূচি ছিল, সেগুলো সিম্বলিক নির্দেশনার মাধ্যমে প্রতিফলন ঘটানো হয়। যেমন: 'বঙ্গবন্ধুর তর্জনী'–এটা কর্মী-সমর্থকদের জন্য একটা নির্দেশ। এভাবে আওয়ামী লীগের বা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ প্রকাশ করা হতো। এভাবেই পত্রিকাটি কার্যত 'দৈনিক বাংলাদেশ বা দৈনিক বাংলা'য় পরিণত হয়েছিল। এটা হয়েছিল ১৯৭০ সালেই।

মিনহাজ: 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর 'দৈনিক বাংলা' হয়ে যাওয়ার এই বিষয়টি মার্চ থেকে, নাকি এরও আগে থেকেই হয়েছিল?

তোয়াব খান: আমি বলব এটা ১৯৭০-এর ১ জানুয়ারি থেকে। ১৯৭০-এর নির্বাচনের আগেই ১ জানুয়ারি থেকে ইয়াহিয়া খান পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি চালু করলেন। তারপর থেকেই দৈনিক পাকিস্তান রাজনৈতিকভাবে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ায়। গণমানুষ, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের পক্ষে চলে আসে।

মিনহাজ: হোটেল পূর্বাণী থেকে বঙ্গবন্ধু ১ মার্চই ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি ৭ই মার্চ ভাষণ দেবেন। এ ভাষণ কাভারের জন্য ৬ মার্চ আপনারা কী ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

তোয়াব খান: সিদ্ধান্ত ছিল বঙ্গবন্ধু যা বলবেন, যেভাবে বলবেন, মূল যে নির্দেশনা দেবেন–সেগুলোই ছাপা হবে, কোনো কিছুই বাদ যাবে না। বড়ো পরিসরে, গুরুত্ব সহকারে ছাপা হবে। ৮ মার্চের সংবাদপত্র দেখলে দেখবেন, 'সংগ্রাম চলবেই' এই মূল শিরোনামের সংবাদ যেমন এসেছে, ঠিক তেমনই মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম–এটাও নিউজে এসেছে। মূল শিরোনামের ওপরে চারটি ব্লকে ছোটো ছোটো করে বঙ্গবন্ধুর চারটা শর্তও প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রকাশই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য।

মিনহাজ: ৮ মার্চের পত্রিকায় আপানারা ছেপেছিলেন বঙ্গবন্ধুর দুর্নিবার তর্জনী তুলে ঘোষণার ছবি। পত্রিকাজুড়ে প্রায় সাত কলামে ছবিটি ছেপেছিলেন। আমি জানতে চাই, ৭ই মার্চ দৈনিক পাকিস্তানের নিউজ রুমের পরিস্থিতিটা কেমন ছিল?

তোয়াব খান: তখন দৈনিক পাকিস্তানে প্রতিদিন সকালে রিপোর্টার, নিউজ এডিটর, চিফ রিপোর্টার ও সাব-এডিটরদের নিয়ে মিটিং হতো। সেখানে সিদ্ধান্ত হতো কী কী নিউজ যাবে। কোন রিপোর্ট কীভাবে কাভার করা হবে প্রভৃতি। ৭ই মার্চের ওই সকালে মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর জনসভায় যা যা হবে, যেভাবে হবে, যতটা সম্ভব ঠিক সেভাবে তুলে ধরা হবে।

মিনহাজ: ৮ মার্চের পত্রিকায় শেষের পাতায় আপনারা সাতটি ছবি ছেপেছিলেন। যেখানে ছিল বঙ্গবন্ধুর তর্জনীর ছবি, মানুষের হাতে লাঠি, পতাকা হাতে নারী, লাঙল কাঁধে কৃষকদের ছবি প্রভৃতি। এর পেছনে কি আপনাদের আলাদা কোনো পরিকল্পনা ছিল?

তোয়াব খান: সাংবাদিকতায় একটা কথা আছে–'এক হাজার শব্দের চেয়েও একটি ছবি অনেক বেশি কার্যকর।' আর সে কারণেই সারা বিশ্বের প্রথম সারির ও পাঠকপ্রিয় সংবাদপত্রগুলো তাদের সংবাদপত্রের পাতায় ফটোগ্রাফিক রিফ্লেকশন রাখার চেষ্টা করে। আমরাও সেই চেষ্টা করতাম। তবে এক্ষেত্রে দৈনিক পাকিস্তান-এর একটা সুবিধা ছিল। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময় আমাদের অফিসটি পুড়ে যাওয়ার পর আমরা পত্রিকা ছাপানোর জন্য নতুন যন্ত্রপাতি পাই। আধুনিক সুবিধাসংবলিত প্রেস। এতে আমরা ছবি ভালো করে ছাপতে পারতাম। যুদ্ধের কিছু আগে থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় ছবির ব্যবহার বাড়তে থাকে।

আমি আপনার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়ার আগে একটু পুরাতন কথায় আসি। ১৯৭০ সালে উপকূলে একটা ভয়াবহ সাইক্লোন হয়। ১২ নভেম্বর। সাইক্লোন হওয়ার পর আমরা চিন্তা করলাম ছোটো ছোটো ছবি দিয়ে যদি ফিচার করা যায়, তাহলে একটা ভালো ফল পাব। পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে। ওই সাইক্লোনটি ছিল ভয়াবহ। লাখ লাখ মানুষ মারা যান। উপকূলের অনেক লোকালয় এতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। পাঠককে আকৃষ্ট করার জন্য আমরা এই সাইক্লোনের বড়ো বড়ো ছবি ছাপানোর পরিকল্পনা করেছিলাম। আমরা সফল হয়েছিলাম। দেখা গেছে, একটা লাশ পড়ে আছে, তার ওপরে একটা মরা সাপ। অর্থাৎ একটা সাইক্লোন মানুষ ও সাপ–উভয়ের জীবন শেষ করে দিয়েছে। মূলত ওই সাফল্য থেকেই আমরা ৮ মার্চের পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ফটোফিচার করার সিদ্ধান্ত নিই।

মিনহাজ: ওই সময়ে অন্যান্য পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

তোয়াব খান: ইংরেজি পত্রিকা দ্য পিপল মোটামুটিভাবে জনগণের পক্ষে ছিল। এটি এক অর্থে আওয়ামী লীগের মুখপত্র ছিল। বাংলা যারা পড়তে পারতেন না, তাদের কাছে পত্রিকাটি জনপ্রিয় ছিল।

মিনহাজ: বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ টেলিভিশনে প্রচার হয়নি। আমরা বড়ো একটা শট অর্থাৎ ওপর থেকে তোলা একটা ছবি দেখি, এই ভিডিয়োটা পাকিস্তানের ডিএসপি (বর্তমানে ডিএফপি) নামের প্রকাশনা সংস্থাটি করেছিল, নাকি অন্য কেউ?

তোয়াব খান: এ বিষয়ে দুই ধরনের তথ্য আছে। মূলত কাজও করেছিল আলাদা দুটি পক্ষ। পুরো সমাবেশের যে ছবিটা ওপর থেকে তোলা, সেটা ডিএসপির তরফ থেকে ধারণ করা হয়েছিল। আবুল খায়ের নামের একজন ব্যক্তি ওই সময় ডিএসপিতে কাজ করতেন। উনি অভিনয়ও করতেন। আরেকটা বেসরকারি কোম্পানি অডিয়ো রেকর্ডিং করেছিল, সেখানে কলিম শরাফি সাহেবও কাজ করতেন। এর আগেই কলিম শরাফিকে টেলিভিশন থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর তিনি ওই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। তারা জয় বাংলা রেকর্ড বের করেছিলেন। যাই হোক, যত দূর আমি জানি, ছবিটা ডিএসপির প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে না, ব্যক্তিগত তরফ থেকে তোলা হয়েছিল।

> ২৫ মার্চের পর থেকেই কার্যত সংবাদপত্র অবরুদ্ধ। কঠোর সেন্সর বলবৎ। যা বলা হবে, অর্থাৎ পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যা বলবে, সেভাবেই লিখতে হবে, ছাপাতে হবে। এদিক-সেদিক হওয়ার সুযোগ নেই

মিনহাজ: যতটা জানি, ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে আপনি দৈনিক ইত্তেফাকের সিরাজুদ্দীন হোসেনকে বলেছিলেন, আপনারা (দৈনিক পাকিস্তান) পত্রিকা বের করতে পারছেন না। আপনার কাছে ওই রাতের ঘটনাপ্রবাহ একটু জানতে চাই।

তোয়াব খান: ২৫ মার্চ রাত ১০টার কিছু আগে থেকে আর্মি ঢাকার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এরপর গোলাগুলির আওয়াজ হতে থাকে। আমাদের অফিসে শ্রমিক লীগের নেতা মান্নান এসেছিলেন। তিনি যে হঠাৎ কোথা থেকে এসে উদয় হলেন, তা আমি আজও বুঝতে পারিনি। তাঁকে বললাম, 'কী বুঝলেন, কী চলছে?' তিনি বললেন, 'শুরু হয়ে গেছে। আমরা আর ফিরছি না। আমরা চলে যাচ্ছি।' এই বলে তিনি চলে গেলেন। আমরা তখন অফিসে বন্দি। বন্দি এজন্য যে, চতুর্দিকে গোলাগুলি। কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছিল। আমাদের একই ভবনে ছিল মর্নিং নিউজের অফিস। মর্নিং নিউজে শহীদুল ইসলাম নামের একজন সাংবাদিক কাজ করতেন। পরে তিনি বাংলাদেশ টাইমসের এডিটর ছিলেন। শহীদুল হক ভীষণ মুসিবতে ছিলেন। কারণ, তাঁর পরিবার রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের কাছে থাকত। রাজারবাগ এলাকায়ই বেশির ভাগ গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমরা ওইদিন যে পত্রিকাটি ছাপানোর জন্য তৈরি করেছিলাম, সেটি ওইদিন ছাপা হয়নি (২৬ মার্চ)। তবে অনেক পরে ওই পত্রিকাটি ছাপা হয়েছিল। জিয়াউর রহমানের কিংবা এরশাদের শাসনামলের দিকে।

মিনহাজ: ২৫ মার্চের পরের দিনগুলো আপনার কেমন কেটেছিল? তখন তো সবকিছু পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষের কঠোর নিয়ন্ত্রণে ছিল।

তোয়াব খান: তখন সময়গুলো ছিল আতঙ্কের। ১৯৭১ সালের মে মাসের এক বিকালের কথা উল্লেখ করতে চাই। ওইদিন সকালে আমরা অফিসে যাই। কাজ শেষে বাসায় ফিরে বিকালের দিকে আমি বিশ্রাম করছিলাম। এমন সময় আমাদের পত্রিকার চিফ রিপোর্টার ফোন করেন। তিনি জানতে চাইলেন আমার স্বাস্থ্য কেমন আছে। আমি একটু অবাকই হলাম। কারণ, সকালেই অফিসে দেখা হলো। সম্পাদকীয় ও বার্তা বিভাগে সবার সঙ্গে মিটিং-আলোচনায় নানা কথা হলো। চিফ রিপোর্টারকে জানালাম, স্বাস্থ্যে আমার নতুন কিছু ঘটেনি, ভালোই আছি। তিনি কেন যেন জবাব দিলেন–না! আপনার স্বাস্থ্য ভালো নেই। তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখান। একটু অবাক করা ইঙ্গিতপূর্ণ কথা।

টেলিফোনে আর কথা হলো না। ভাবছিলাম হঠাৎ স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্‌বেগ কেন? চিফ রিপোর্টার কোনো নবীন সাংবাদিক নন। অনেক অভিজ্ঞ। দীর্ঘদিন পেশায় ও রাজনীতিতে পোড় খাওয়া ব্যক্তি। সাংবাদিক ইউনিয়নেরও একজন সক্রিয় নেতা। সব মহলেই তার যথেষ্ট পরিচিতি আছে। তাই স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর এই প্রশ্ন একটু চিন্তার বিষয়। ইতোমধ্যে আবার টেলিফোন। এবার আমাদের পত্রিকার একজন সিনিয়র সহকারী সম্পাদক। তিনি অবশ্য হেঁয়ালিতে যাননি। সরাসরি জানালেন, যা কিছু করার আজ রাতের মধ্যেই শেষ করে ফেলুন। কাল আপনার সঙ্গে দেখা না হলেই মঙ্গল। আরও স্পষ্ট ইঙ্গিত পেলাম। বুঝতে পারলাম, আমার আর অফিসে না যাওয়াই ভালো।

মিনহাজ: ওই সময়ের সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাই।

তোয়াব খান: ২৫ মার্চের পর থেকেই কার্যত সংবাদপত্র অবরুদ্ধ। কঠোর সেন্সর বলবৎ। যা বলা হবে, অর্থাৎ পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যা বলবে, সেভাবেই লিখতে হবে, ছাপাতে হবে। এদিক-সেদিক হওয়ার সুযোগ নেই। ২৫ মার্চের পর বেশ কয়েকদিন তো সংবাদপত্র বন্ধই ছিল। প্রকাশনা আবার শুরুর পর দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দেওয়া খবরই শুধু ছাপা হতো। সম্পাদকীয় কেউ লিখতেন না। নিজস্ব প্রতিবেদন প্রকাশের ধারেকাছেও কেউ যেত না। দখলদারদের দেওয়া তথ্যবিবরণী (হ্যান্ডআউট) এবং তাদের বার্তা সংস্থা এপিপি (অ্যাসোসিয়েট প্রেস অব পাকিস্তান) পরিবেশিত খবরই শুধু ছাপা হতো।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই দখলদারদের খেয়াল হলো সংবাদপত্রগুলো নিজেদের কোনো অভিমত বা সম্পাদকীয় প্রকাশ করছে না। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম এলো অবশ্যই সম্পাদকীয় লিখতে হবে। ওই অবরুদ্ধ সময়ে পত্রিকা পড়ার লোক, গ্রাহক সংখ্যা একেবারে তলানিতে। দলে দলে লোক ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে বা যাচ্ছে। দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ-এর অফিস কামানের গোলা দাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানি সেনারা। পত্রিকাগুলো পৃষ্ঠাসংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছে। সেনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা আসার পর কয়েকটি পত্রিকা প্রথমে সম্পাদকীয় লিখতে শুরু করল। অবজারভার হাউজের দুটি পত্রিকা–পাকিস্তান অবজারভার আর পূর্বদেশ। প্রেস ট্রাস্টের মর্নিং নিউজ ও আজাদও লেখা শুরু করেছিল। এদিকে কয়েকদিনের মধ্যেই দৈনিক পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হলো, দ্রুত সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত না হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো উপায় না দেখে দৈনিক পাকিস্তানও সম্পাদকীয় লেখার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায়। সহকারী সম্পাদক কবি হাসান হাফিজুর রহমান ২৫ মার্চের পর থেকে অফিসে আসেন না। তিনি নাকি ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন। হাসান সাহেব ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ বিজয় দিবসের আগে আর কোনোদিনই দৈনিক পাকিস্তানের কাজে যোগ

দেননি। কবি শামসুর রাহমান ঢাকাতেই ছিলেন, তবে অফিসে আসতেন না। আহমেদ হুমায়ুন অফিসে আসেন; কিন্তু সম্পাদকীয় লেখার ফরমান জারি হওয়ার পর ঢাকা ছেড়ে দেশের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে যান। নিয়মিত অফিস করেন সহকারী সম্পাদকের মধ্যে সানাউল্লাহ নূরী আর মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। তারা সম্পাদকীয় লিখতে অস্বীকৃতি জানান। তাদের বক্তব্য দখলদারদের গুণকীর্তনে তাদেরই শুধু ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই তারা প্রথম দিন লিখবেন না। শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় না পেয়ে প্রবীণ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকেই সেদিন সম্পাদকীয় লিখতে হয়েছিল।

মিনহাজ: তারপর কী ঘটল? পরিস্থিতি কি স্বাভাবিক হলো?

তোয়াব খান: এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে দখলদার পাকিস্তানিরা এটা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লাগে যে, সর্বত্র স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। সবকিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। যদিও হত্যাযজ্ঞ চলছিল। মানুষ ঢাকা ছেড়ে পালাচ্ছিল। আমি দৈনিক পাকিস্তান অফিসে দাঁড়িয়ে লাল ত্রিপল দিয়ে ঢেকে মরদেহ বোঝাই ট্রাক চলাচল করতে দেখেছি। তবে সেনা কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করেছিল। ঢাকায় সবকিছু স্বাভাবিক–এমন বিষয় প্রচার-প্রকাশের জন্য তারা সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধিদল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় পাঠায়। এই প্রতিনিধিদলে লাহোর-করাচির অনেক নামকরা সাংবাদিক ছিলেন। ছিলেন এসআর ঘোরি, এবিএম জাফরিসহ আরও অনেকেই। আবার এটাও শুনেছি মাজহার আলী খান (প্রখ্যাত বামপন্থি নেতা) এটি চৌধুরী, আসরার আহমেদের মতো সম্পাদক-সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দখলদারদের 'স্বাভাবিক অবস্থা' প্রমাণের ঢাক পেটানোর চেষ্টায় সবচেয়ে বড়ো ব্যাক ফায়ার করেছিলেন অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস। তিনি এখানে এসে ঘুরে গিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাযজ্ঞ নিয়ে 'জেনোসাইড' শিরোনামের একটি প্রতিবেদন লেখেন। কিন্তু নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার জন্য তিনি তখন পাকিস্তান থেকে সেটি প্রকাশ করতে পারেননি। পাকিস্তানের মর্নিং নিউজের পাশাপাশি অ্যান্থনি লন্ডনের দ্য সানডে টাইমসে কাজ করতেন। তিনি ওই প্রতিবেদনটি দ্য সানডে টাইমসে প্রকাশ করেছিলেন ১৯৭১ সালের ১৩ জুন, যা নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এর আগে তিনি তাঁর পরিবারকে লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর নিজেও দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করেছিলেন। এরপর অ্যান্থনি পাকিস্তানি দখলদারদের মৃত্যুঘণ্টা বাজানোর মতো একটি বই লিখেছিলেন–'দ্য রেপ অব বাংলাদেশ'।

মিনহাজ: আপনি কবে, কীভাবে, কোন পথে ঢাকা থেকে ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। ভারতে পৌঁছে আপনি কী করেছিলেন?

তোয়াব খান: আমার জন্য দৈনিক পাকিস্তানে কাজ করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর অনুচর জামায়াত নেতারা শান্তি ও সংহতি কমিটির আলখেল্লা নিয়ে সাংবাদিক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ওপর নজরদারি শুরু করে। তারা নিয়মিত ইনফরমারের কাজ করছিল। মোহাম্মদপুর এলাকায় বসবাসরত আমাদের পত্রিকার এক নারী সাংবাদিকের মাধ্যমে আমাকে সাবধানে থাকার অনুরোধ করেন। কারফিউয়ের মধ্যে আটকা পড়ে মোহাম্মদপুরের ওই নারীকে তার এক আত্মীয়ের (যিনি জামায়াত নেতা) বাসায় রাত কাটাতে হয়েছিল। সেখানে তিনি জামায়াত নেতার সহকর্মীদের আলোচনা থেকে জানতে পারেন, দৈনিক পাকিস্তানের বার্তা সম্পাদককে সরিয়ে না দিলে পাকিস্তানপ্রেমীদের খবরাখবর ওই পত্রিকায় ভালোভাবে যাবে না। তাই পাকিস্তানকে হেফাজত করার স্বার্থেই তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জামায়াত নেতাদের মুখে 'কঠোর ব্যবস্থা'র কথা শুনে ভদ্রমহিলা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। একই সময়ে আরও একটি ঘটনা আমার নিরাপত্তা নিয়ে সহকর্মীদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়। একরাতে মর্নিং নিউজ অফিসের গেটে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিল। এ নিয়ে তদন্তে এসে পাকিস্তানি বাহিনী মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান ভবনটিতে তদন্ত তল্লাশির নামে ত্রাস সৃষ্টি করে। সন্ধ্যায় পাকিস্তানি সেনাদের আরও একটি দল এসে বিকালের শিফটে কর্মরত সাংবাদিকদের রীতিমতো জেরা শুরু করে দেয়। পরিস্থিতি আরও ভীতিকর হয়ে ওঠে। আমি দ্রুত ঢাকা ত্যাগের প্রস্তুতি শুরু করি। সীমান্ত পার হয়ে আমি প্রথমে বক্সনগর পৌঁছাই। সেখানে লাউড স্পিকারে গান চলছিল 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি...।' এরপর এলো মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি–'জয় বাংলা' এবং 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

আগরতলা পৌঁছেই আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ সরকারের ক্যাম্প অফিসে নাম নথিভুক্ত করে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের সনদ তথা চিরকুট গ্রহণ করি। ১৯৭১ সালে এই চিরকুটের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ত্রিপুরা-পশ্চিমবঙ্গের যেখানেই যান, জয় বাংলার ওই ক্ষুদ্র চিরকুটটি প্রায় ম্যাজিকের মতো কাজ করত। আমি যত দ্রুত সম্ভব কলকাতায় পৌঁছাতে চাচ্ছিলাম। সেখানে আমাদের আত্মীয়স্বজন আছে।

মিনহাজ: কলকাতা পৌঁছে কী করলেন?

তোয়াব খান: কলকাতায় পৌঁছেই জীবনধারণের অপরিহার্য কিছু কাজ শেষ করে গেলাম বাংলাদেশ মিশন অফিসে। এটা আগে ছিল পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনের অফিস। ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী ২৫ মার্চে গণহত্যা শুরু হলে সদলবলে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। এরপর পুরো ডেপুটি হাইকমিশন অফিস ভবন বাংলাদেশ মিশনে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী তথা উল্লেখযোগ্য যাঁরাই আসছেন শরণার্থী হিসাবে, তাঁদের সবাই একবার বাংলাদেশ মিশন ঘুরে যাচ্ছেন। মিশন তাই সব সময় লোকারণ্য থাকত। আমার ছোটো ভাই বাচ্চু ও আমিও গেলাম। উদ্দেশ্য–যদি পরিচিত কারও সাক্ষাৎ পাই। প্রথম দিনেই টেলিভিশনের জামিল চৌধুরী, মুস্তফা মনোয়ার, চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানসহ অনেকের সঙ্গে দেখা হলো। জামিল চৌধুরী আমাকে রেডিয়োতে নিউজ অপারেশনের জন্য একটি বাজেট তৈরি করতে বললেন। আমি কিছুটা বিস্মিত। কারণ, কোথায় নিউজ প্রচার হবে, সেটা কি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র, নাকি যুদ্ধাবস্থায় কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো একটি ব্যবস্থা? এসব প্রশ্ন আমার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

মিনহাজ: তারপর তো খুব দ্রুত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কাজ শুরু হলো এবং সেখানেও আপনি আপনার পূর্বপরিচিত অনেককেই পেয়েছিলেন?

তোয়াব খান: স্বাধীন বাংলা বেতারের একনিষ্ঠ কর্মী, সাংবাদিক ও শিল্পীদের সঙ্গে একে একে পরিচিত হতে শুরু করলাম। তবে সৌভাগ্যের বিষয় ছিল–অনেকেই আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন। বার্তা বিভাগের দায়িত্বে থাকা কামাল লোহানী দৈনিক সংবাদে আমার সহকর্মী ছিলেন। বেতার কেন্দ্রের অন্যান্য দায়িত্বে প্রশাসনের আসফাকুর রহমান, বাংলা সংবাদ পাঠক সৈয়দ হাসান ইমাম, ইংরেজি সংবাদের দায়িত্বে ছিলেন আলী যাকের ও আলমগীর কবির।

মিনহাজঃ আপনি 'পিন্ডির প্রলাপ' সংবাদ ভাষ্যটি নিয়ে কাজ করতেন। এ বিষয়ে যদি বিস্তারিত একটু বলতেন। আর সার্বিকভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালা ও শ্রোতাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই?

তোয়াব খানঃ আমার সংবাদভাষ্যটির নাম দেওয়া হয় 'পিন্ডির প্রলাপ'। সত্যি কথা বলতে কী, স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান শোনার জন্য শরণার্থীশিবিরে এবং শিবিরের বাইরে আশ্রয় গ্রহণকারী লাখ লাখ মানুষ প্রতিদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। শুধু যে শরণার্থীরাই অনুষ্ঠান শুনতেন, এমন নয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের ৩০-৪০ শতাংশই ছিল পূর্ববঙ্গের। এরা সবাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একনিষ্ঠ শ্রোতা। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হওয়া সম্প্রচারটি চলত সন্ধ্যা থেকে ৪-৫ ঘণ্টা। সকালেও অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো। প্রচারিত অনুষ্ঠানের মধ্যে সংবাদ, সংবাদভাষ্য, দেশাত্মবোধক গান, নাটক থাকত। প্রচার করা হতো বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ। অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল এমআর আখতার মুকুলের চরমপত্র। মুকুল সাহেব চরমপত্র নিজে লিখতেন এবং স্বকণ্ঠে ঢাকাইয়া উচ্চারণে বিশেষ বাচনভঙ্গিতে পাঠ করতেন। অনুষ্ঠানটি শোনার জন্য শরণার্থীশিবিরের লোকজন, বাড়িঘরে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীরা, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা–সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। এছাড়া পাকিস্তানের লম্পট স্বৈর সেনাশাসক ইয়াহিয়া খানের কার্যকলাপ নিয়ে একটি ব্যঙ্গাত্মক ধারাবাহিক নাটক 'জল্লাদের দরবার'ও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পায়।

মিনহাজঃ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১। এদিন বেতারকেন্দ্রে আপনারা কী করেছিলেন। ঐতিহাসিক এই দিনটিতে বেতারে কী সম্প্রচার হয়েছিল?

তোয়াব খানঃ পাকিস্তানি দখলদারদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ উপলক্ষ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গান লেখা হলো তাৎক্ষণিকভাবে। গানটি ছিল 'বিজয় নিশান উড়ছে ওই, বাংলার ঘরে ঘরে।' সুর দিলেন সুজেয় শ্যাম। আর সেই সুরের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল বাংলার ঘরে ঘরে। এরপর মুক্ত স্বদেশে ফেরার পালা। ২২ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এমন সময় জানানো হলো কাল, অর্থাৎ ২৩ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকার দেশে ফিরে যাবে সন্ধ্যায়। সকালে স্বাধীন বাংলা বেতারের একটি বিশেষ দল ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ বিমানে ঢাকা যাবে। এই বিমানে আমাকেও যেতে হবে। এই দলটিকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ঢাকায় ফিরে রেডিয়ো বাংলাদেশের ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান সম্প্রচার চালু করতে হবে। নানা ঝুটঝামেলায় আগে থেকেই ঢাকা কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ আছে। ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরুর সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

মিনহাজঃ সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার।

তোয়াব খানঃ আপনাকেও ধন্যবাদ।

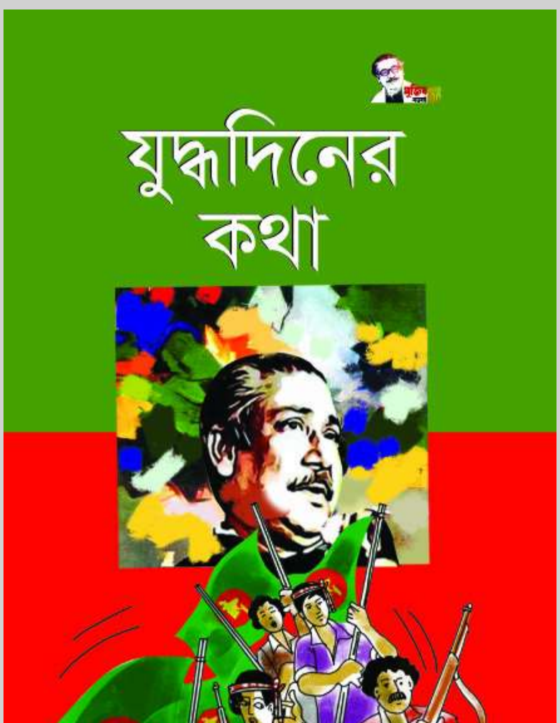

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সত্য উদ্‌ঘাটন সত্যের বিকাশ এবং সত্যের প্রকাশ

তোয়াব খান

শুরুতেই ‘মিডিয়া পাওয়ার’ নিয়ে জনমনে প্রশ্ন, উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠা বিষয়ে কিছু আলোচনা করার তাগিদ অনুভব করছি। অনেকে আবার ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্‌বিগ্ন। প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে আলোকচিত্র তথা ফটোগ্রাফের দুর্নিবার আকর্ষণের কথাও মনে রাখা দরকার। ফটোগ্রাফের সম্মোহনী ক্ষমতা নিয়ে একটি উদাহরণ উল্লেখ করতে চাই। প্রখ্যাত সাংবাদিক হ্যারল্ড ইভান্স তাঁর এডিটিং অ্যান্ড ডিজাইন গ্রন্থমালার পিকচার অন পেজ বইয়ের শেষ প্রচ্ছদে একটি ছবি ছেপেছেন। ছবিতে এক যুবতিকে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে। তার সামনে পড়ে আছে এক ব্যক্তি। ছবিটির যিনি বিষয়বস্তু ওই ব্যক্তি কিছুক্ষণ আগে সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে। আর ওই মেয়েটি হচ্ছে তার ফিঁয়াসে। পাওয়ার অব ক্যামেরা এত আকর্ষণীয়, মোহময় যে, ওই মেয়েটিকে ভুলিয়ে দিয়েছে তার প্রেমিক সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে। সে অনায়াসে ক্যামেরায় লাস্যময় পোজ দিচ্ছে। সাংবাদিকতার পাওয়ারটা এখানেই। এই পাওয়ার তথা শক্তিটাকে আমরা কীভাবে ব্যবহার করব, এটাই আজকের সবচেয়ে চিন্তার বিষয়।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। আমি কিছু দিন আগে সাতক্ষীরা প্রেস ক্লাবে গিয়েছিলাম। ২০০১ সালেও গিয়েছিলাম। তখনকার প্রেস ক্লাব আর আজকের প্রেস ক্লাব, দুটোর তুলনা করলেই বুঝতে পারা যায়, প্রসারটা কত বেশি। সেদিন তো

আমার মনে হয় জনাদশেক উপস্থিত ছিলেন। সেটাই অনেক বেশি মনে হয়েছিল। আর এবারে এত সাংবাদিকের উপস্থিতি! উপস্থিত প্রত্যেকে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো অর্গানাইজেশনকে প্রতিনিধিত্ব করেন। এখানেই একটা জিনিস পরিষ্কার–প্রত্যেকেই কোনো না কোনো মিডিয়ায় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। যেমন প্রিন্ট মানে খবরের কাগজ, ইলেকট্রনিক অর্থাৎ টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন প্রভৃতি। যে যেখানেই কাজ করুন, তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য খবর/প্রতিবেদন পাঠাচ্ছেন। নিজ নিজ মাধ্যমের উপযোগী প্রতিবেদন পাঠাচ্ছেন, এটা তো ধরেই নেওয়া যায়। মাধ্যমের স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী প্রতিবেদনের ভাষা ও কাঠামো গড়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিশ্রুত গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মার্শাল ম্যাকলুহানের একটি কথা মনে পড়ছে। ম্যাকলুহান বলেছেন, সাংবাদিকতায় এমন দিন আসবে, মিডিয়াই নির্ধারণ করবে বিষয়বস্তু। কথাটা, 'মিডিয়া ইজ দ্য মেসেজ'। অন্যভাবে বলা চলে, মাধ্যমই নির্ধারণ করে দেয় বাণীটা কীভাবে যাবে। সাংবাদিকতার বৃহত্তর পরিসরে এই ইলেকট্রনিক মিডিয়া, অনলাইন প্রভৃতিতে যারা কাজ করছেন, দেখবেন সংবাদপত্রের ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার তফাত রয়েছে। পার্থক্যটার কারণ, যে মাধ্যমে তাঁরা কাজ করছেন, আমার নিজের ধারণা এবং সাংবাদিকতা বিজ্ঞান একই কথা বলে, মাধ্যমটা যেরকম হবে তাৎক্ষণিকভাবে ভাষা এবং তার ব্যবহার কাঠামোটা, সেভাবেই গড়ে ওঠে। টেলিভিশনে যাকে নিউজ পাঠাতে হচ্ছে, তিনি পাঠাচ্ছেন তাৎক্ষণিকভাবে যেটা ঘটে যাচ্ছে। সকালবেলা যে নিউজটা যাচ্ছে সন্ধ্যার মধ্যে হয়তো দেখা যায় ওই একই জিনিস গড়িয়ে অন্যভাবে পরিণতি লাভ করছে। সকালবেলা যদি একজন দর্শক বা শ্রোতা শুধু সকালের খবরটা দেখে থাকেন এবং সন্ধ্যায় যদি আর না দেখেন, তাহলে কিন্তু তার ইমপ্রেশনে থাকবে ওই সকালের খবরটাই। এক্ষেত্রে এই সাংবাদিকের আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব হবে সকালের যে অবস্থা ছিল, সন্ধ্যায় এর পরিণতিটা একইভাবে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা। তা যদি না হয়, তিনি যদি ওইভাবে সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটনার পেছনে লেগে থেকে, এর পরিণতিটা একই গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশন না করেন, তাহলে তিনি পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। কারণ, সকালে তিনি একপর্যায়ে দেখে গেছেন সন্ধ্যায় তা আরেক পর্যায়ে গেছে। তবে এই বিভ্রান্তি দূর করার একটি পথ খুলে দিয়েছে ব্রেকিং নিউজ। সমস্যা দেখা দেয় বেশি নিউজের ব্রেকিং নিয়ে। এ প্রসঙ্গে আরও কতগুলো সমস্যা জড়ো হয়েছে। আগে ছিল সিন্ডিকেটেড কলাম। দুনিয়াতে সবচেয়ে বড়ো সিন্ডিকেট কলামিস্ট ছিলেন ওয়াল্টার লিপম্যান। সারা দুনিয়াতে বহু পত্রিকায় তার কলাম ছাপা হতো। ওয়াল্টার লিপম্যানের পরে আরও অনেক নামকরা সাংবাদিক সিন্ডিকেটে কলাম লেখেন। কিন্তু এখন চালু হয়েছে অন্যরকম সিন্ডিকেট। দেখা যায়, বিভিন্ন জায়গায় ঘটনা পাঁচটি পত্রিকার লোক, পাঁচটি চ্যানেলের লোক, অনলাইনের তিনজনসহ ১৩ জন কাভার করছে। ১৩ জনের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে যান তিনজন মিলে। ওই তিনজন যেটা কাভার করেন, সেটা সিন্ডিকেট হয়ে যায়। অর্থাৎ অন্য পত্রিকায়ও এগুলো চলে যায়। এমন অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। দেখা যায়, এক পত্রিকায় ছাপা কপিতে আরেক পত্রিকার 'সংবাদদাতাকে বলেন', অর্থাৎ অন্য পত্রিকায় কলাম হুবহু চলে গেছে। এটা আজকের দিনে একটা বিপজ্জনক অবস্থা। অর্থাৎ যে ইনফরমেশন বা তথ্যগুলো পরিবেশন করা হচ্ছে, যে উপাত্ত সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে, সেগুলো একধরনের বিশেষ অভিমত বা রঙের ছোঁয়ায় চ্যানেলাইজ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা ৩২টি অর্গানাইজেশনের পরিবর্তে ১০টি অর্গানাইজেশন বা ১৩টি অর্গানাইজেশনে গিয়ে কাভার করে দিলেন, পরিণতিতে তথ্য ও উপাত্ত পরিবেশনার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত 'হ্যান্ড আউট' জাতীয় একটি বিশেষ প্যাটার্ন গড়ে ওঠার সমূহ শঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্যাটার্নটা বিশেষ কোনো পাঠকশ্রেণির পক্ষে যেতে পারে। সরকারের পক্ষে যেতে পারে। বিরোধী দলের পক্ষে যেতে পারে বা অন্য কোনো প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে যেতে পারে। এটার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, যে প্রক্রিয়ায় এবং যেভাবে এই মাধ্যমগুলো কাজ করছে, এরই পরিণতি এটা। ব্যক্তিবিশেষ কাউকে এজন্য দায়ী করে লাভ নেই।

খবরের কাগজে কাজ করতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় সাংবাদিকদের। এখানে বিদেশের কথাই বলা ভালো, নিজের দেশের চেয়ে। আমাদের দেশেও এমন ঘটনা আছে। তবে আমেরিকায় উদাহরণ বেশি পাওয়া যাবে। কারণ হচ্ছে, আমেরিকানদের এ বিষয়ে লেখা বইও বেশি, তারা লেখেনও অনেক। ওদের কাজও বেশি। একজন আলোকচিত্রীকে ছবি তোলার স্বার্থে অনেক কিছু করতে বা বলতে হয়। হয়তো একজন বললেন, ওখানে আলো নেই, এখানে এসে দাঁড়ান। ওই রকম একটি ঘটনা। আইসেন হাওয়ার যেদিন প্রেসিডেন্ট হলেন ওই দিনের ঘটনা। হোয়াইট হাউজের বিশেষ হলে ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠান। ট্রলির ওপর ক্যামেরা নিয়ে বসে আছেন তিন-চারজন ফটোগ্রাফার। ওরা ছবি তুলছেন আইসেন হাওয়ারের কাছে পাওয়ার হ্যান্ডওভার করছেন ট্রুম্যান। এক ফটোগ্রাফার তুলতে পারেননি। তিনি চিৎকার করে বললেন, মি. প্রেসিডেন্ট আরেকবার করুন। তারা অর্থাৎ ট্রুম্যান-আইসেন হাওয়ার আরেকবার হাত মেলালেন। ফটোগ্রাফিক কাভারেজের মাহাত্ম্যে হ্যারল্ড ইভান্সের বইয়ের ব্যাক কভারের মহিলাটি যেমন ভুলে গিয়েছিল তার প্রেমিকের মৃত্যুর কথা, তেমনই প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও আইসেন হাওয়ার দ্বিতীয়বার হাত মেলালেন। শুধু তাই নয়, আরও আছে। ট্রুম্যান এবং আইসেন হাওয়ারের সম্পর্ক মোটেও ভালো ছিল না। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় একটু হাসি হাসি থাকলে মুখ হাস্যোজ্জ্বল হয়। ট্রুম্যান একদম হাসেননি। কারণ ট্রুম্যান পছন্দই করেননি আইসেন হাওয়ারকে। দুজন ক্যামেরাম্যান বলে উঠলেন, মি. প্রেসিডেন্ট একটু হাসুন, না হাসলে ছবি ভালো আসে না। এ কথা বলে তাদের হাসালেন। তারপর ছবি তুললেন। এগুলো হচ্ছে আজকের দিনে সাংবাদিকতার অবধারিত অনুষঙ্গ।

আজকের দিনে আমরা সাংবাদিকতার বিপদের কথা বলি। অভিজ্ঞতায় দেখেছি প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিরা অতীতে যখন বিদেশে যেতেন বা ফিরে আসতেন, তখন সাংবাদিকরা চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরতেন। ফলটা হতো এই, না সাংবাদিকরা কথা শুনতে পান, না অন্যরা প্রশ্ন করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এখন অবশ্য পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আগের দিনে সাংবাদিকরা যেভাবে কাজ করতেন, আজকের দিনে তার অনেক পরিবর্তন এসেছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বিষয় বৈচিত্র্যেও বিরাট বিস্ফোরণ ঘটেছে। আজ যে সাংবাদিক এক পত্রিকায় কাজ করেন, আরেক পত্রিকায় সেটা একইভাবে নাও যেতে পারে। যায়ও না। আমি একরকমভাবে প্রকাশ করতে পারি, আরেকজন অন্যভাবে পরিবেশন করে। যে জিনিসটা আমাদের সাংবাদিক হিসাবে সব সময় মনে রাখতে হবে–সত্য বা ট্রুথ এটা হচ্ছে লাস্ট কথা। যেভাবেই হোক সত্যটাকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। তা না হলে মানুষের কাছে এর কোনো দাম নেই। কোনো তথ্যের কোনো দাম নেই। এটাই প্রধান। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, প্রেক্ষাপট যাই থাক, মতাদর্শ যাই হোক এবং দেশের অবস্থা যাই ঘটুক, যেভাবেই ঘটুক না কেন–আল্টিমেটলি একজন সাংবাদিকের কাজ হবে সত্য উদ্ঘাটন, সত্যের বিকাশ, সত্যের প্রকাশ অর্থাৎ সত্যটা মানুষের সামনে

> ইউরোপে সাংবাদিকতার বিকাশ হয়েছে অন্যধারায়। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ফিউডাল সভ্যতার পরে অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক বিকাশের যুগ যখন শুরু হলো, তখন থেকে ওখানে সাংবাদিকতার শুরু। আর আমাদের দেশে শুরু হয়েছে উপনিবেশের বিরুদ্ধে অথবা উপনিবেশের পক্ষে

তুলে ধরা। এটাই শেষ কথা। আর অন্যদিকে আমাদের এখন একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এটা আগেও ছিল, কিন্তু এখন বেশি দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে আমরা সাংবাদিকতার বাইরে চলে যাচ্ছি। এটা কোনো কোনো রেডিয়ো চ্যানেলে ঘটছে। কোনো কোনো টেলিভিশন চ্যানেলেও দেখা যাচ্ছে। এখানে বিশেষ ধরনের কিছু কিছু সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব সাক্ষাৎকার অনেক ক্ষেত্রেই বিতর্ক সভায় পর্যবসিত হয়। একের পর এক প্রশ্নের মাধ্যমে বিশেষ ধরনের উপসংহারে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়। এসব বিষয় নিয়ে আগেও কিছু কিছু পত্রিকায় আলোচনা হয়েছে। আমার মনে আছে, ১৯৭৬ শেষ অথবা ১৯৭৭-এর শুরু, রাজশাহীতে একটা ঘটনা ঘটেছিল। একটা মেয়ের মার্ডারের কেস, রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ওই মার্ডার কেসটা নিয়ে পত্রিকায় এমনভাবে রিপোর্ট করা শুরু হলো যে শেষ পর্যন্ত যারা ছিলেন ক্ষমতায় তারাও বললেন যে, ট্রায়াল বাই প্রেস। অর্থাৎ খবরের কাগজওয়ালারাই এ রকম পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। নীহার বানু হত্যাকাণ্ডে এ রকম ঘটেছিল। মনে রাখতে হবে, সাংবাদিকের কাজটা কিন্তু ট্রায়াল নয়, এর জন্য আদালত আছে। সাংবাদিক তথ্য-উপাত্তগুলো তুলে ধরবেন এবং নিশ্চিতভাবেই ওটা করবেন সত্য তুলে ধরার জন্য। সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য। তা উপস্থাপনের মাধ্যমে যাতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়, এটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

আরেকটি বিষয়, দেশের স্বার্থ আর সাংবাদিকতার স্বার্থ এ দুটো যেন পরস্পরবিরোধী কখনো না হয়। দেশ যদি না থাকে, সাংবাদিকতাও থাকে না। তবে এটাও বলা হয়েছে যেমন জেফারসনের কথা, Stateless Newspaper or State without Newspaper—এই প্রশ্নে তিনি বলেছেন, I will prefer Newspaper without state। কিন্তু এটাই শেষ নয়। আজ আমাদের দেশের কথাই বলি, বাংলাদেশের জন্য ৩০ লাখ লোক জীবন দিয়েছে, আরও কয়েক লাখ মা-বোন কত যে নির্যাতন সহ্য করেছে, তারওপর এক কোটি লোক বাস্তুচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। অসংখ্য লোকের কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে একটা দেশ হয়েছে। এখন আমি কি এমন কোনো কাজ করব বা আমার মাধ্যমে এমন অবস্থার সৃষ্টি করব, যেখানে আমার নিজের দেশের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়? যদি তা না হয়, তাহলে কতগুলো মৌলিক নীতি নিশ্চয়ই আমাদের মেনে চলতে হবে। এই মৌলিক নীতিগুলো হচ্ছে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। বাংলাদেশটা কেন হয়েছে? বাংলাদেশ হয়েছে কারণ ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে এই বাংলাদেশের মানুষ তার নিজের ভাষার এবং নিজের সংস্কৃতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, নিজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছে দিনের পর দিন। আমার ভাষা, ভাষার কোনো শ্রেণিভেদ নেই। বাংলা ভাষায় যিনি কোটিপতি, তিনিও কথা বলেন। যিনি গরিব, তিনিও বাংলা ভাষায় কথা বলেন। এখানে কোনো শ্রেণিভেদ নেই। এজন্যই ভাষার যখন প্রশ্ন দেখা দিল, বাঙালি ঐক্যবদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিল। ভাষার প্রশ্নে তো ইসলামি ব্রাদারহুড, তমুদ্দিন মজলিশও এসে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্যদিকে যারা প্রগতিশীল, তারাও সমানে দাঁড়িয়েছে, আওয়ামী লীগ এসেছে, সবাই এসেছে। প্রথম আঘাত এলো ভাষার ওপর। এরপর হামলা হলো সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্য। তারপর আঘাত এলো মানুষের কথা বলার অধিকারে। আমি কথা বলতে পারব না, নিজের মতপ্রকাশ করতে পারব না। বাঙালিমাত্রই নিজের কথা নিজের মতো করে প্রকাশে বিশ্বাস করে। দেখা গেল, বাঙালির মুখের কথা বলার যে অধিকার, সেটাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কথা বললেই, কোনো কিছু বললেই জেলে যেতে হয়। তো এভাবে এলো কয়েকটি জরুরি বিষয়, আমি যখন কথা বলি, তখন আমি আমার জাত বা সম্প্রদায় দেখে কখনো আলোচনা করি না। আমার পাশে আরেকজন সংখ্যালঘু থাকতে পারে, সংখ্যালঘু একজন বুদ্ধিস্ট হতে পারে, একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী হতে পারে, একজন খ্রিষ্টান হতে পারে। আমাদের দেশেই এ ধরনের জিনিস দীর্ঘদিন চলেছে, অর্থাৎ এভাবে চলতে চলতেই এসেছে অসাম্প্রদায়িকতা। যাকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে এক অর্থে ইউরোপে চলে। আমাদের দেশে অন্যরকম। আমাদের দেশে সর্বধর্মের অধিকার বোঝায়। এই বিষয়গুলোই হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের চারটি মূলনীতি। আজ যদি এমন কোনো কাজ আমরা করি, যার ফলে এই নীতিগুলোতেই আঘাত পড়ে এবং এর ফলে আলটিমেটলি দেশের মূলনীতি নিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে, সেক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা কী হবে? সাংবাদিকদের ভূমিকা কী হবে? আগেকার দিনের সাংবাদিক যারা ছিলেন, অর্থাৎ অতীতের সাংবাদিকতা এবং আজকের দিনের সাংবাদিকতায় দুটোর পার্থক্য দেখতে পাই। অতীতে '৪৭-এর আগেও যারা সাংবাদিকতা করেছেন, তারা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের একটা সূত্র ধরেই এ পেশায় এসেছেন। হয় ব্রিটিশের সঙ্গে অথবা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। আবার পাকিস্তান আমলে দেখা গেছে, যারা পাকিস্তানপন্থি, তারা হয় পত্রিকা প্রকাশ করেছেন অথবা জনগণের কথা বলার জন্য মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এটা একধরনের ঐতিহ্যও বলা চলে।

ইউরোপে সাংবাদিকতার বিকাশ হয়েছে অন্যধারায়। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ফিউডাল সভ্যতার পরে অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক বিকাশের যুগ যখন শুরু হলো, তখন থেকে ওখানে সাংবাদিকতার শুরু। আর আমাদের দেশে শুরু হয়েছে উপনিবেশের বিরুদ্ধে অথবা

উপনিবেশের পক্ষে। তারপর আবার পাকিস্তান, পাকিস্তানের পক্ষে-বিপক্ষে প্রভৃতি। একপর্যায়ে অর্থাৎ ষাটের দশকে প্রথম ওয়েজবোর্ড, '৬১ সালে ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়ন শুরু হলো। এরপর থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু সাংবাদিকতায় একটা মৌলিক কাঠামো গড়ে উঠল অর্থাৎ সাংবাদিকদের বেতন কাঠামো গড়ে উঠেছে, সাংবাদিকদের অধিকার কী কী হবে, পেশাগত অধিকার কী কী হবে, তা নির্ধারণ করা হলো প্রভৃতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সালে যে আইনটি পাশ হয় অর্থাৎ working condition law একজন সাংবাদিক কাজ করলে তার কী কী অধিকার আছে, ৮ ঘণ্টা কাজ, এটা ওয়েজবোর্ডে ছিল আগে কিন্তু আইন ছিল না। শ্রমঘণ্টা ঠিক করা, বেতনের হার ঠিক করা, ছুটি নির্ধারণ করা প্রভৃতি আইনি কাঠামো তৈরি হলো। এটা হওয়ার পর থেকে সাংবাদিকতা এবং সংবাদপত্রের একটা শিল্প হিসাবে বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হলো। সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশের পথ খুলে যাওয়ার পর ক্রমান্বয়ে আজ আমরা পৌঁছেছি এই পর্যায়ে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসায় পর যখন এই দেশে টেলিভিশন চ্যানেলকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হলো, তখন থেকে একুশে, তারপরে হচ্ছে এটিএন বাংলা প্রভৃতি চারটি চ্যানেল চালু হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বেসরকারি আরও অনেক চ্যানেলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ফলটা হয়েছে, একদিকে টেলিভিশন, আরেকদিকে সংবাদপত্র। সাহাবুদ্দীনের সময় বিশেষ ক্ষমতা আইনটি সংশোধন করা হয়। আইনটি সংশোধন করে বলা হয়, যে কেউ ইচ্ছে করলে খবরের কাগজ, দৈনিক পত্রিকা বের করতে পারবে। পত্রিকা বের করার বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না। প্রয়াত সাংবাদিক এবিএম মূসা একটা কাগজ বের করার পারমিশন চেয়েছিলেন, এটা খালেদা জিয়ার সরকারের সময়ে রিফিউজ করা হয়। মামলা করায় কোর্ট বলে দেয় কোনো বাধা দেওয়া যাবে না। যাই হোক, এখন আইনে কোনো বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। ওই আইনটি এমনভাবে করা হয়েছে, যে কেউ পত্রিকা প্রকাশ করতে চাইলে তাকে অনুমতি দিতে হবে। যদি কর্তৃপক্ষ বাধা দেয়, তাহলে He can go to the court এবং কোর্টে গিয়ে অনুমতি নিয়ে আসতে পারবেন। এটা অধিকার তাদের। আরেকটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেটা হচ্ছে কম্পিউটার। আগে হাতে কম্পোজ করে, লাইনো টাইপে, মনো টাইপে কম্পোজ করে, পরে মেশিনে দেন, ধমধম করে কয়েক শ কপি ছাপেন। এর বেশি ছাপতে পারবেন না। কারণ সাধারণ ছাপাখানায় এর চেয়ে বেশি ছাপার ক্ষমতা অনেকেরই ছিল না। তারপর কম্পিউটার যখন এলো, বাড়ি বসে কম্পোজ করতে পারছেন। ছাপাখানাও হয়েছে অনেক। এখন এই দুটো মিলে পত্রিকা বের করার সুযোগ সর্বত্র। ফলে এখন পত্রিকা চতুর্দিক থেকে যেমন আসছে, তেমনই পত্রিকার আইনগত কাঠামো নিয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমাদের একটি বিষয়ে স্মরণ রাখতে হবে এবং জোর দিতে হবে। পত্রিকা যিনিই বের করুন, মানুষের অর্থাৎ সংবাদপত্রের কর্মীদের জীবনধারণের মিনিমাম চাহিদাটুকু যদি পূরণ না করা হয়, তাহলে কোনো সময়ই সাংবাদিকতা সৎ পথে, সুস্থ পথে চলতে পারবে না। সেটা হয় ব্ল্যাকমেইলের হাতিয়ার অথবা বিপথে চালিত হবে। অর্থাৎ অন্যভাবে ইউজ করা হবে, অন্যভাবে ইউজ করার হাতিয়ার হয়ে যাবে। এটাকে মনে রাখা দরকার।

আর সব থেকে বড়ো বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে এই আজকের দিনের সাংবাদিকতার সর্বব্যাপক একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে। এটা ভালো দিক। তথ্যের বিকাশ ও তথ্যের প্রবাহ অবাধ হচ্ছে, লোকজনের সুযোগ হচ্ছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, যারা এ পেশার সঙ্গে জড়িত হচ্ছেন তারা তো মানুষ। মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার তাদের আছে।

> আমি মনে করি, সাংবাদিক হিসাবে, মানুষ হিসাবে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার আমাদের আছে। আমাদের পেশাকে আমরা মনে করি সম্মানজনক পেশা এবং মানুষকে সেবা করার জন্যই এই প্রফেশন

সাংবাদিক হিসাবে আমি মনে করি, সাংবাদিক হিসাবে, মানুষ হিসাবে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার আমাদের আছে। আমাদের পেশাকে আমরা মনে করি সম্মানজনক পেশা এবং মানুষকে সেবা করার জন্যই এই প্রফেশন।

সাংবাদিক হিসাবে দুটো দিকনির্দেশনা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। একটা সাংবাদিকের আত্মসচেতনতা ও নিজের পেশা, পেশার দায়িত্ব এবং তার নীতিমালা মেনে চলার জন্য দৃঢ়সংকল্প। এগুলো হচ্ছে একটা দিক, আরেকটা দিক হচ্ছে এই পেশাটিকে এবং এই পেশার বাহন তা সংবাদপত্রই হোক, রেডিয়ো হোক, টেলিভিশন হোক, একে বিপথে চালানোর জন্য কেউ যেন চেষ্টা করতে না পারে। এই দুটো জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে আজ সংবাদপত্রের তথা তথ্য বিকাশের যে সুযোগ এসেছে তা সৎ পথে চলবে।

[সাতক্ষীরা প্রেস ক্লাবে সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত ভাষণের ভিত্তিতে রচিত]

নির্বাচিত ‘পিন্ডির প্রলাপ’

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল অভূতপূর্ব সাহস, উদ্দীপনা আর অনুপ্রেরণার উৎস। রক্তঝরা সেই দিনগুলোয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনী থেকে সাধারণ মানুষের জন্য এক অনন্য প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। রণাঙ্গন থেকে শহর, গ্রাম, বন্দরনগর–সবখানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল মুক্তিকামী মানুষের কণ্ঠস্বর। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের মধ্য দিয়েই যাত্রা শুরু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মতো সেসময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে উপস্থাপিত ‘পিন্ডির প্রলাপ’ জনমানসে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। ‘পিন্ডির প্রলাপ’ শীর্ষক ধারাবাহিক কথিকাগুলো ছিল তোয়াব খান রচিত। দেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রণাঙ্গনের বীর যোদ্ধারা বেতারযন্ত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনেছেন মহাত্মাদের ঐশীবাণী শ্রবণের মতো–গভীর আগ্রহে, মনোযোগে এবং প্রবল বিশ্বাসে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি প্রেস ট্রাস্টের একজন হয়েও অতি গোপনে দেশ ত্যাগ করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তারপর তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিজের দায়িত্বটি পালন করেন। তাঁর লেখা ও উপস্থাপনায় ‘পিন্ডির প্রলাপ’-এর আলোচিত দুটি কথিকা পাঠকের জন্য–

গোমর ফাঁক

একেবারে গোমর ফাঁক। ইয়াহিয়া খানের জবর বাক্যবাগীশ জেনারেল এএকে নিয়াজীকে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছে মার্কিন কাগজ নিউজউইক। এত জাঁক করে তিনি বলেছিলেন মার্চে যা করেছি, প্রয়োজনবোধে আবার তা করব ঢাকার রাজপথে। আমাদের ট্যাংকগুলো অপেক্ষা করছে। কিন্তু নিউজউইকের সিনিয়র এডিটর আরনড দ্য ব্রগ্রেভ তো আর নিয়াজীর ক্যান্টনমেন্টের সিপাই নন। সাফ বলে দিয়েছেন, জেনারেল তুমি মূর্খের স্বর্গে বাস করছ। পায়ের তলায় মাটি যে কতটা সরে গেছে, তার তো খবর রাখ না। বাংলাদেশের শতকরা ২৫ ভাগ থানার ওপর তোমাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। মুক্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। খোদ ঢাকার উত্তরাংশ এখন মুক্ত।

বাংলাদেশে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অভিযান শেষ করার লম্বা-চওড়া আশ্বাসদানকারী নরঘাতক জেনারেল টিক্কা খানের সুবৃহৎ বেলুনটি চুপসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এএকে নিয়াজীর আবির্ভাব। পাঞ্জাবের সাবেক সামরিক প্রশাসক এই জেনারেলের ভূমিকা সামরিক চক্রের জঘন্য ষড়যন্ত্রগুলোতে কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। '৬৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ–সারাদেশ গর্জে উঠেছিল আইয়ুবের স্বৈরাচারী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, হরতাল মিছিল আর ঘেরাওয়ে প্রকম্পিত হয়েছিল সামন্ত প্রভু একচেটিয়া পুঁজিপতি আর সামরিক চক্রের ষড়যন্ত্রের প্রাসাদ। পশ্চিমা আমলারা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছিল সামরিক অফিসারদের বাড়িতে বাড়িতে। সেই সময়ে এই নিয়াজীকে দেখা যায় ঝিলামের একটি সামরিক ছাউনি এলাকায় অফিসারদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে, সংগঠিত করতে।

উনসত্তর সালের ২৫ মার্চের ইয়াহিয়ার সামরিক অভ্যুত্থানের নেপথ্য কাহিনি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ বলেছিল, জেনারেল নিয়াজীর–যাকে সামরিক চক্র টাইগার নিয়াজী বলে অভিহিত করে থাকে নেতৃত্বে একদল অফিসার এই মর্মে আলটিমেটাম দিয়েছিল যে, তারা বাংলাদেশের তথাকথিত অরাজকতা কোনো মতেই বরদাস্ত করতে রাজি নয়। তাদের মতে, এই সময়ে যা চলেছে তাকে বাড়তে দিলে সব যাবে। পাঞ্জাবের ঝিলামের সেই কুখ্যাত বৈঠকেই ঠিক করা হয়েছিল, বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যদি দরকার হয় তবে লক্ষ লক্ষ লোককে সাবাড় করে দেয়া হবে। শহরে-নগরে বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিলের ওপর প্রয়োজনবোধে চালানো হবে ট্যাংক। তবে নিয়াজীর বড়ো আফসোস ছিল। উনসত্তর সালেই এগুলো ঘটেনি বলে। অতএব নিয়াজী অ্যান্ড কোম্পানি বাংলাদেশের গণহত্যার ব্লু-প্রিন্টটা দুবছরের জন্য কোল্ড স্টোরেজে রেখে দিয়েছিল। তাই একাত্তর সালের মার্চের শুরুতেই বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলনের আলোতেই এইসব জেনারেল তাদের বিপদের সংকেত দেখতে পেল। কায়েমি স্বার্থ বিপন্ন। তাই তারা চক্রান্তের জাল ফেলতে শুরু করল একে একে। অবশেষে এলো ২৫ মার্চের সেই কালরাত।

টিক্কা খানের সাথে সাথে জেনারেল নিয়াজী বাংলাদেশে এলেও চলমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তাঁর আগমনবার্তা ঘোষিত হয়নি। কিছুটা নেপথ্যেই রয়ে গেলেন তিনি। দায়িত্ব দেয়া হলো বাঙালি নিধনের অপারেশনের। তারপর একদিন রণাঙ্গনে তাঁর আবির্ভাব সামরিক প্রশাসক ও ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডাররূপে। কিন্তু এবারে জেনারেল সাহেবের ইস্টার্ন কমান্ড একেবারেই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে মুক্তিবাহিনীর গোলা আর বুলেটের আঘাতে আঘাতে। অবস্থা বেগতিক দেখে একদল খুদে ডাকাত রাজাকার শাসক সৃষ্টি করা হলো, যাদেরকে নিউজউইক পত্রিকা 'রাস্তার বখাটে তস্কর দল' বলে অভিহিত করেছে। পত্রিকাটির মতে, 'অস্ত্র হাতে আছে বলে রাজাকারের দল নিজেদের খোদা বলে মনে করে। যত্রতত্র নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের কাছ থেকে টাকাপয়সা আদায় করছে। যারা তাদের আশ্রয় দিতে বা মেয়ে লোক সরবরাহ করতে অস্বীকার করছে তাদেরকে হত্যা করেছে গুলি করে। এরপর মুক্তিবাহিনীর দুর্বার অভিযানের সামনে সেনাবাহিনী প্রথমেই ঠেলে দিচ্ছে এইসব নির্বোধ রাজাকারের দলকে।'

এসব সত্ত্বেও জেনারেল নিয়াজীর লম্বা-চওড়া দাবি কেন? নিউজ উইকের মতে, পরাজয়ের গ্লানি কিছুটা লাঘবের জন্য জেনারেলের জল্লাদ বাহিনী নিরীহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে ব্যাপক হারে, চালাচ্ছে লুটতরাজ। সংবাদদাতা ঢাকার ডেমরা এলাকার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ইয়াহিয়ার সৈন্যদল এই গ্রামটি ঘেরাও করে ১২ থেকে ৩৫ বছরের প্রত্যেকটি মহিলার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায় এবং ১২ বছরের ওপরের সকল পুরুষকে হত্যা করে। এই হত্যা, লুণ্ঠন ও পাশবিকতায়ও শেষ রক্ষা যে অসম্ভব–দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আর পদ্মা, মেঘনা, যমুনার উত্তাল তরঙ্গের দিকে তাকালেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বুমেরাং

ব্যাপারটি এমন বুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে, পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনীর জবরদস্ত সেনাপতি ইয়াহিয়া খান সাহেব তা কি ভাবতে পেরেছিলেন? দুধকলা দিয়ে পুষে যাকে চীনে পাঠানো হলো, সেই কিনা বলে ফোঁস? চীন কি আশ্বাস দিয়েছে না দিয়েছে, সেটা বড়ো কথা নয়। চীন থেকে এসেই ভুট্টো চীনা হাজী বলে জাহির করতে আরম্ভ করে দিয়েছে নিজেকে। ভুট্টোর বাগাড়ম্বরে মদত দিচ্ছে কয়েকজন ডাকসাইটে আমলা আর খোদ ইয়াহিয়ার জঙ্গি চক্রের ইনার সার্কেলের জনা-দুই জেনারেল। আমলাদের মধ্যে আছেন পাকিস্তানের সাবেক ফরেন সেক্রেটারি এসএম ইউসুফ। ভদ্রলোক এখন পাকিস্তান স্টিল করপোরেশনের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত। অপর একজন হলেন ইয়াহিয়ার অর্থ উপদেষ্টা এমএম আহমদ। এ দুজন নাকি চীনে প্রেরিত প্রতিনিধিদলের নেতৃপদ ভুট্টোকে দেয়ার ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ দিয়েছিলেন। একেবারে শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। আইয়ুবের কালোদশকে পর্বতপ্রমাণ অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিতে কোনো একটি আমলার ব্যক্তিগত অবদান যদি সর্বাধিক হয়ে থাকে তবে তার নাম নিঃসন্দেহে এমএম আহমদ। এই দশ বছরে অর্থ দপ্তরের চাবিকাঠি কোনো সময়েই ভদ্রলোকের হাতছাড়া হয়নি, তিনিও হতে দেননি। অর্থই অনর্থের মূল। তাই তিনি এটাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করেছেন কখনো অর্থ সেক্রেটারি, কোনো সময়ে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান বা খোদ প্রেসিডেন্টের অর্থ উপদেষ্টা হিসাবে। তাঁরই অধিনায়কত্বে পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যারোমিটার একলাফে শুধু মাথায় ওঠেনি পাকিস্তানের কুখ্যাত ২২ পরিবার দেশের ব্যাংক বিমা ও

কলকারখানার শতকরা ৮০ ভাগ সম্পদ করায়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছে। পাঞ্জাবের কায়েমি স্বার্থবাদী মহল তথা সামন্ত ভূস্বামীর গায়ে আঁচড়টি লাগুক, এমন কিছু ভদ্রলোক হতে দেননি অলংকৃত সময়েই। অন্যদিকে এককালের ফরেন সেক্রেটারি এসএম ইউসুফ বর্তমানে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদ অলংকৃত করে আছেন যাকে লুটপাট সংস্থা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। এই প্রতিষ্ঠান–পাকিস্তান স্টিল করপোরেশনের কাজ কারবার এমন এলাহি ব্যাপার যে তার তুলনা মেলা সত্যিই অসম্ভব। করাচিতে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের ভার দেয়া হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রায় ১৪ বছর আগে। এই কারখানা স্থাপনের যে সর্বমোট আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা রিপোর্ট তৈরির আগেই তার চেয়ে বেশ কয়েক কোটি টাকা বেশি সাবাড় করে খেয়েছেন। এর মধ্যে বিদেশ থেকে পাওয়া, অবশ্যই ঋণ হিসাবে ১৫ কোটি টাকার বৈদেশিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। আর জনগণের এই পয়সা লুটপাটের প্রধান বখরা জুটেছে ২২ পরিবারের লোকজনদের ভাগ্যে। এই দুজন খ্যাতিমান আমলার সঙ্গে আরও একজন জেনারেল এসে দাঁড়িয়েছেন ভুট্টোর পেছনে। পাকিস্তান মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের প্রধান মেজর জেনারেল আকবর খান। ইসলামের গ্লোরি একটু নড়চড় হলেই জেনারেল সাহেব একেবারে অগ্নিশর্মা। এজন্যই তিনি মওদুদীর ইসলামি জামায়াতকে আকাশে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে মওদুদীর ইসলাম আর তার জামায়াত পশ্চিম পাকিস্তানে একেবারে ধরাশায়ী হওয়াতে তিনি প্রমাদ গুনলেন। ইসলামের গ্লোরি যায় যায়। কী উপায়? উপায় মিলেও গেল। ভুট্টোর টমটম মজুতই ছিল, উঠে বসলেন। শুরু হলো ইসলামাবাদের সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের সেই সুরম্য প্রাসাদটিতে একের পর এক চক্রান্ত।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও ভুট্টোর 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' গোছের ভাবসাব পছন্দ করতে পারছেন না পশ্চিম পাকিস্তানের আরও দুজন জেনারেল গভর্নর। সিন্ধুর গভর্নর লে. জে. রহমান গুল ও পাঞ্জাবের গভর্নর লে. জে. আকিকুর রহমান। তাঁরা নাকি ইয়াহিয়া খানকে বলেছেন, ভুট্টোর বুজরুকিতে বিশ্বাস করার কিছু নেই, পিকিং তাকে খালি হাতে শুধু মিষ্টি কথায় ফেরত পাঠিয়েছে। সব মিলিয়ে পিন্ডিতে এখন জেনারেলে জেনারেলে টক্কর লাগার মতো অবস্থা। তাই ইয়াহিয়ার নাকি আহার বিহার শিকেয় উঠেছে।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের এক প্রখ্যাত সাংবাদিক ও পাকিস্তান টাইমস পত্রিকার সাবেক সম্পাদক মাজহার আলী খান সম্প্রতি বলেছেন, পঁয়ষট্টি সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানকে যত সৈন্য বা অফিসার হারাতে হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি মারা পড়েছে মুক্তিবাহিনীর হাতে। পিআইএ-এর বিমানগুলো ঢাকা থেকে বয়ে এনেছে প্রতিদিন আহত অফিসার ও জোয়ানদের। জনাব খান কুয়েতের ডেইলি নিউজ পত্রিকায় লিখিত নিবন্ধে এ কথা জানিয়েছেন। তাঁর মতে, সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব শুধু বড়ো শহরগুলোতেই সীমাবদ্ধ। এর ফলে পাকিস্তানের অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে অরাজকতা। মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। তিনি প্রশ্ন করছেন এভাবে আর কতদিন চলতে পারে যখন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, সেনাবাহিনীর চাহিদা বাড়ছে দিনের পর দিন এবং বৈদেশিক সাহায্যের উৎসগুলো শুকিয়ে আসছে। জনাব খান বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের বহু লোক এখন এটা প্রকাশ্যেই বলছেন, ১৯৫৮ সালে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলকে যদি খারাপ রূপে আখ্যায়িত করা হয়, তবে দুজন জেনারেলের ১৩ বছরের শাসনে দেশ এখন বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়ে বলতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা এখন ভাবতে শুরু করেছে বাংলাদেশকে (পূর্ব পাকিস্তান) জোর করে আর আটকে রাখা সম্ভব কি না।

পশ্চিম পাকিস্তানের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যদি ইতিহাসের পাতা একবার উলটে দেখেন, বাংলার মানুষের রক্তের অক্ষরে লেখা স্বাধীনতার দৃপ্ত শপথের নতুন অধ্যায় সেখানে দেখতে পাবেন।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

দ্রোণাচার্যের জন্য ভালোবাসা

আকিল জামান ইনু

জনকণ্ঠ ভবন। সাততলা। ঘড়িতে সেকেন্ড কাঁটার ছ শ লাফে ঘণ্টার কাঁটা রাত ৮টা ছোঁবে। সুনশান নীরবতা (সম্পাদকীয় বিভাগ সাধারণত ৭টার মধ্যে ফাঁকা হয়ে যায়)। বসে আছি উপদেষ্টা সম্পাদকের (তোয়াব খান) কক্ষের দরজার ঠিক সামনের ডেস্কে। দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন তোয়াব খান। আমাকে দেখেই ভরাট কণ্ঠের জিজ্ঞাসা, 'অ্যাই, তুমি এতক্ষণ কী করো?'

বললাম, 'স্যার (সংবাদপত্রে ব্যতিক্রম হলেও আমি তাঁকে স্যার বলতাম), একটা গ্রন্থ নিয়ে লিখছি। রাতেই লেখাটা শেষ করে কম্পোজে দিতে হবে। কাল সকালে মেকআপ। ক পা এগিয়ে আবার ফিরে এলেন। বললেন, 'দেখি, বইটা।'

হাতে তুলে দিতেই আমি যেন মহাপাতকী–এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমরা যে কী শুরু করলে!' গ্রন্থটি ছিল তাঁকে নিয়ে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) থেকে প্রকাশিত 'অগ্রজের সঙ্গে একদিন (৩): তোয়াব খান'।

আবার হাত বাড়ালেন, 'দেখি কী লিখছ?'

হায় ধরণি, এখনো দ্বিধা হলে না! কোথায় লুকাই? ফ্যান ঘুরছে, তবু কপালজুড়ে ঘামের জাল। ভয়ে ভয়ে পাতাগুলো তাঁর হাতে তুলে দিলাম। ভরসা একটাই–আমার দুর্বোধ্য হস্তলেখা উদ্ধারে তিনি নিশ্চিত ব্যর্থ হবেন। তাও হলো না। ভূয়োদর্শী চোখ তাঁর। কিছুটা দেখে পাতাগুলো ফেরত দিলেন। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি। ধড়ে প্রাণ

তাঁর দেখার সঙ্গে আমাদের দেখার পার্থক্যটা একটি পশ্চিমা প্রবাদ উদ্ধৃত করে বলি–তাকায় সবাই কিন্তু সবাই দেখে না। তিনি দেখতেন এবং ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায় ছিলেন অনন্য

ফিরে এলো। সুযোগের সাহস নিয়ে বলে ফেললাম, "স্যার, আমিও কিন্তু অভিযোগটা রাখব লেখায়। ওই যে আত্মজীবনী না লেখাটা আপনার 'ফৌজদারি অপরাধ'।" এবার সশব্দ হাসি উদ্ভাসিত মুখে মন্তব্য, 'ওহ! আর বলো না। আত্মজীবনীর জন্য ওরা তো পারলে আমাকে মার লাগায়!'

আমার সামনে তখন অন্য এক তোয়াব খান। সেদিন অনেক কথাই বলেছিলেন। কথার ছলে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া। লিফটে ওঠার ঠিক আগ মুহূর্তে, আলতো করে কবজি ছুঁয়ে বললেন, 'শোনো, বেশি কিছু লিখো না। লোকে আবার বলবে–ব্যাটা নিজের পত্রিকা পেয়ে নিজেকে নিয়ে খুব লেখাচ্ছে।' অতঃপর লিফটের গহ্বরে প্রবেশ। লিফট নেমে যাচ্ছে ৬, ৫, ৪, ...। পায়ের পাতায় বিস্ময়ের শেকড় নিয়ে আমি ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। দ্রোণাচার্য কি আমাকে কোনো বার্তা দিলেন? আমার হৃদয়ে গুনগুন করছেন রবীন্দ্রনাথ–'আমারে না যেন করি প্রচার/আমার আপন কাজে...।'

তিনি এমনই। নিভৃতচারী। ছয় দশকের সাংবাদিকতা জীবনে তিনি দেখেছেন অনেক। তবে তাঁর দেখার সঙ্গে আমাদের দেখার পার্থক্যটা একটি পশ্চিমা প্রবাদ উদ্ধৃত করে বলি–তাকায় সবাই কিন্তু সবাই দেখে না। তিনি দেখতেন এবং ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায় ছিলেন অনন্য। তাঁর ভাষায়, 'এই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত কিন্তু অনেক সময় বদলে দিতে পারে সংবাদপত্রের ধারা।' যা দেখেছেন, তা হৃদয় আর মস্তিষ্কের কোষে জমা রাখার ক্ষমতায় জুড়ি ছিল না তাঁর। অনেক তথ্য জানতে তাঁর স্মৃতির দরজায় কড়া নাড়ি সুযোগ পেলেই। কখনো বলেন, কখনো–স্পিকটি নট। বিশেষ করে, মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদের সম্পর্ক কেমন ছিল? প্রায়শই জিজ্ঞাসা করি। এ প্রসঙ্গ এলেই এড়িয়ে যাওয়া ধরনের উত্তর দেন, আমার তৃষ্ণা মেটে না। দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে এড়িয়ে যেতে চাইলে কখন হতে হয় পিছল বাইম, তা তাঁর মতো করে আর কে শিখেছে! এড়িয়ে যাওয়ার শৈল্পিক কায়দা তাঁর সহজ করায়ত্ত। কিন্তু আমিও যে তাঁর ক্ষুরে মাথা কামানো, ছাইমাখা হাতে তথ্যশিকারি। লেগে থাকি। বোধকরি বিরক্ত হয়েই কিংবা এই নাছোড়বান্দার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে একদিন অনেকটা ভূমিকা করে তারপর বললেন, 'কোনো মন্তব্য করছি না। কেবল একটা ঘটনা বলি, বাকিটা তুমি বুঝে নিও।' তিনি বলছেন–আমি মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা। শেষে অনেকটা বোকার মতোই বললাম, 'স্যার, তারপরও আপনি লিখছেন না! এটা তো ইতিহাসের কাছে আপনার দায়। এছাড়া এমন দশটা ঘটনা থাকলেও তো বেস্ট সেলার নিশ্চিত।' ফিরে গেলেন দ্রোণাচার্যের ভূমিকায়, 'হয়তো লিখব। কিন্তু কী লিখব, কতটুকু লিখব–সেটা একটা বিবেচনার বিষয়। সব লিখতে হবে–এমনও নয়। আর ওই বেস্ট সেলার-ফেলার কোনো কাজের কথা হলো না। হলে এমনি হবে।' নীরবে বেরিয়ে আসি। আমার মাথায় ঘুরছে, 'কী লিখব', 'কতটুকু লিখব'। আর 'হলে এমনি হবে'–হৃদয়ে গুঞ্জন; গীতার কর্মযোগ অধ্যায়ের অমিয় বাণী–'কর্ম করে যাও কিন্তু ফলের আশা করো না।'

তাঁর শেখানোর পদ্ধতিটা খুব উচ্চকিত কিছু ছিল না। ছিল না চাপিয়ে দেওয়া। বিষয়টা এমন–আপনি চাইলে নিতে পারেন, নাও পারেন। অনুবাদের দিকে ঝোঁক থেকে কিছু অনুবাদ করতাম। মাঝেমধ্যে তিনি নিজেও টাইম, ইকোনমিস্ট এমন অনেক ম্যাগাজিন থেকে বিষয় মার্ক করে পাঠাতেন অনুবাদের জন্য। অনুবাদের বিষয় নির্বাচনে তাঁর জুড়ি ছিল না। এমন সব বিষয় নির্বাচন করে পাঠাতেন আমি চমকে যেতাম। ফিদেল ক্যাস্ত্রো পৃথিবীতে তাঁর শেষ শ্বাসটি গ্রহণ করেছেন। পরদিন সন্ধ্যা, আমি অফিস ছাড়ব-ছাড়ব করছি, আলম ভাই একগাদা কাগজ নিয়ে হাজির। স্যার বলে পাঠিয়েছেন এক্ষুনি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করে দিতে হবে। চতুরঙ্গ পাতার জন্য। দেখি, ১৯৬১তে মে দিবসের প্যারেডে ক্যাস্ত্রোর দেওয়া ভাষণ। একটু অবাক হয়েছিলাম, এত থাকতে ভাষণ! এখন বুঝি ক্যাস্ত্রোকে বুঝতে হলে ওই ভাষণের বিকল্প নেই। যেখানে ক্যাস্ত্রো কথা বলেছেন প্রতিটি নির্যাতিত-নিপীড়িত মানবাত্মার পক্ষে। বুকের গভীর থেকে উঠে আসা শব্দাবলি দ্যুতি ছড়ায় অন্য আলোয়। উইনি ম্যাডিকিজিলা ম্যান্ডেলা মারা গেছেন। স্যার, গার্ডিয়ান থেকে একটা লেখা মার্ক করে পাঠালেন উইনিকে নিয়ে। পড়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। লেখক উইনির মৃত্যু-পরবর্তী পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার মিডিয়ার যে ভূমিকা, এর চরিত্র উন্মোচন করেছেন পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো। লেখাটি ছাপা হওয়ার পর এ প্রসঙ্গে দু-একটি কথা শেষে ছোট্ট পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'শোন, সময় পেলে আফ্রিকার ইতিহাসটা আরও পড়বে, ওদের অনেক সংগ্রামী মানুষ আছে আর ওদের লড়াইটাও আলাদা।' চাঁদ একদিন হারিয়ে যাবে, মাছেরা কি ব্যথা পায়, ব্যাঙের তেল নিয়ে দুদেশের দ্বন্দ্ব, ইয়েভতুশেঙ্কো, হ্যানয় হান্না–কিছুই তাঁর নজর এড়াত না। আখেরে লাভ হতো আমার–অনুবাদ করতে গিয়ে আমিও তো শিখেছি।

ব্রেক্সিট নিয়ে তখন চারদিক সরগরম। সদ্য অফিসে আসা ইকোনমিস্ট থেকে ব্রেক্সিট নিয়ে নতুন এক ইস্যু বুঝতে পারছিলাম না। ইস্যুটা নতুন, হঠাৎ করেই আসা। তিনি অফিসে আসতেই, বান্দা হাজির তাঁর কক্ষে–'স্যার, ব্রেক্সিটের এই বিষয়টা বুঝতে পারছি না।'

শুনে একটু বিরক্তি নিয়েই বললেন, 'আরে, ওই ইংরেজ ব্যাটাদের কথা আর বলো না। ওরা যে কী করে! আপাতত বাদ দাও।' বুঝলাম বিষয়টি এখনো তার নজরে আসেনি। ফিরে এলাম। সাত-আটদিন পেরিয়েছে। অফিস সহায়ক আলম ভাই এসে বললেন, 'আপনাকে স্যার এক্ষুনি ডাকছেন।' আজ 'কী আছে কপালে' ভাবতে ভাবতে তাঁর কক্ষে প্রবেশ। সালাম দিতেই ঠোঁটের কোণে স্মিত হাসি নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা তুমি কি ব্রেক্সিটের ওই পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছিলে?' নিজ আগ্রহে যদিও কিছুটা জেনেছি তবু তাঁর মুখ থেকে ব্যাখ্যা শোনার সুযোগ কে ছাড়ে? বললাম, 'স্যার, পুরোটা বুঝতে পারছি না।' দীর্ঘ সময় নিয়ে ইতিহাস টেনে, মানচিত্র ধরে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বলছেন– আমার হৃদয়ে কাহারবা তালে গাইছেন রবীন্দ্রনাথ, 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি, ...'। ইউরোপের রাজনীতি নিয়ে অনেক কথাই বলেছিলেন সেদিন। স্পষ্ট বোঝা যায়, বিষয়টি নিয়ে তিনি অনেক সময় ব্যয় করেছেন। আমার মতো সামান্য এক সহ-সম্পাদকের জানার আগ্রহ মেটানোর তেমন কোনো দায় তো তাঁর ছিল না! গণমাধ্যমের নতুন প্রজন্মের দায়িত্বশীলদের কাছে বিষয়টি কি কোনো বার্তা বহন করে?

সেটা ২০১৭ সালের শুরুর দিক। তখনও বিট কয়েন নিয়ে তেমন কোনো বাতচিত নেই আমাদের এখানে। আমি কিছুটা জেনে সটান হাজির তাঁর কক্ষে, 'স্যার, একটা কভার স্টোরি করতে চাই। বিট কয়েন নিয়ে।' বিস্তারিত শুনে তাঁর মন্তব্য, 'সময় হোক' আর 'আরেকটু দেখ'। তখনকার মতো সান্ত্বনা 'আরেকটু দেখ' আর 'সময় হোক', সঙ্গে 'উদ্ভট বিষয়-আশয়ে একটু কম নজর দাও (অন্য প্রসঙ্গে)'–এমন মৃদু শাসানি সঙ্গী করে বেরিয়ে এলাম। এরপর বছর গড়িয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন সম্পাদকীয় সহকারী হন্তদন্ত হয়ে তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। সামনে পেয়েই বললেন, 'ইনু ভাই, আপনাকে তোয়াব ভাই খুঁজছেন।' 'আজ নিশ্চিত গেছি'– ভাবনা নিয়ে বললাম, 'বিষয়টা কী, চাকরি নট?' তিনি হেসে বললেন, 'আরে না, আপনি কী একটা টাকা না কয়েন বলেছিলেন, সেটা নিয়ে আজ মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। ওই বিষয়ে খুঁজছেন।' দেখা করতেই বললেন, 'শোনো ওই বিট কয়েন না কী যেন বলেছিলে, ওটা নিয়ে কিছু লিখতে পার এখন।' এখনো ভাবি, এটা কী করে সম্ভব! এই যে মনে রাখা! অন্য একদিন জানতে চেয়েছিলাম। মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'এমন কিছু না। চর্চা করে যেতে হবে। দেখ, মানুষের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থাকে, সবার হয়তো সমান হয় না। তবে চর্চা করলে অনেকটাই সম্ভব।' কথাগুলো খুব নতুন কিছু নয়। এই আমি যখন আমার হাঁটুসমান, সেই হাফ প্যান্ট ধরে হাঁটাকাল থেকে শুনে আসছি–চর্চা করো, চর্চা করো। কিন্তু তাঁর উচ্চারিত শব্দাবলির দ্যোতনা ভিন্ন। বিশ্বাস জাগায়–আমারও হবে; কেবল ওই চর্চাটা ...। গুরুবচন অমৃতসমান।

আমরা তাঁকে আপাত নির্লিপ্ত, গম্ভীর, রাশভারী রেখায় আঁকলেও তাঁর রসবোধ ছিল প্রবল। একদিনের ঘটনা বলি, আমাদের আর্টিস্ট সোহেল আশরাফ খান। চরম স্কিনটাইট জিন্স পরে তর্জনীতে চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে, একমুখ দাড়িগোঁফ নিয়ে বিন্দাস মুডে দাঁড়িয়ে আছেন লিফটের সামনে। নিচে নামবেন। কপালে থাকলে যা হয়! যাকে বলে পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে। লিফট থেকে বেরিয়ে এলেন তোয়াব খান। কোনো ভূমিকা ছাড়াই প্রথম প্রশ্ন, 'অ্যাই, তুমি এর মধ্যে ঢুকলা কেমনে?' বেচারা সোহেল! কিছুই না বুঝে, ভ্যাবাচ্যাকা রসগোল্লা চোখে তাকিয়ে আছেন। তিনি আবার বললেন, 'আরে এই যে প্যান্ট, প্যান্ট! এর মধ্যে ঢুকলা কেমনে? ঢুকছ ভালো কথা, এখান থেকে বের হবা কেমনে!' বলেই হাঁটা ধরলেন নিজের কক্ষের উদ্দেশে। এরকম দার্শনিক রসিকতার শিকার সোহেলের মুখটা মনে পড়লে এখনো হাসি পায়। নিজের কথা বলি। আনন্দকণ্ঠ পাতার সম্পাদক দীর্ঘ ছুটিতে। যথারীতি দায়িত্ব বর্তাল, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো– এই আমার ঘাড়ে। আমার তো পালাই পালাই মন। এর মধ্যে এক বলিউড অভিনেত্রীর বিতর্কিত ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল। যদি অব্যাহতি জোটে এই ভাবনায় বিষয়ের সঙ্গে অভিনেত্রীর একটু বেশিই খোলামেলা এক ছবি দিয়ে পাতা সাজিয়ে হাজির তাঁর কক্ষে। দেখলেন। সেই ছবির ওপর কলম রেখে বললেন, 'আর ছবি পেলে না!' বললাম, 'স্যার ওনার ইমেজের সঙ্গে মিল রেখে ছবি দিয়েছি। আপনি বললে বদলে দিই।' চোখ তুলে তাকালেন, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি, 'তা তুমি যখন ওনার ইমেজ রক্ষার মহান দায়িত্ব নিয়েছ, তখন কী আর করা! ইচ্ছে হলে দাও।' সেদিন ওনার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার দরজাটা অনেক দূরে মনে হয়েছিল। ছবিটা বদলে দিয়েছিলাম। রসিকতার চাবুক কতটা ধারালো হতে পারে, সেদিন বুঝেছি।

'যা দেখব তাই লিখব, যা দেখিনি তা লিখব না'–এই বিশ্বাস ধারণ করে তাঁর পথচলা। সিন্ডিকেট রিপোর্টিং-এর বিরুদ্ধে অবস্থান ছিল দৃঢ়। সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা নিয়ে স্পষ্ট করেই বলেছেন– 'আপনি যদি অন্যায়কে চিহ্নিত না করেন, তাহলে ন্যায়কে আপনি বুঝতে পারবেন না এবং আপনাকে বলতে হবে পুরোটাই অর্থাৎ সম্পূর্ণ সত্য বলতে হবে।' সময়ের সঙ্গে নিজেকে বদলেছেন প্রতিনিয়ত। এই পরিবর্তনের গুরুত্ব তিনি বুঝতেন। আমরাও বুঝি তাঁর উক্তিতে, যখন তিনি বলেন– 'মিডিয়ায় ইন্টারমিডিয়েট টেকনোলজি বলে কোনো জিনিস নেই। লেটেস্ট টেকনোলজি সব মিডিয়াকেই গ্রহণ করতে হয়, অন্যথায় আপনি পিছিয়ে পড়বেন।'

বঙ্গবন্ধুর অফিসে কাজ করা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধুর ওখানে আমার কাজ শুরু হলো, তারপর অনেকদিন গেছে, অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখন আমার মনে হয়, আমি যদি আগে থেকে ওখানে থাকতাম, তাহলে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে হয়তো অনেক ঘটনা অন্যভাবে ঘটত।' সেই অনেক ঘটনা কি আর আমাদের জানা হবে? ঘুরেফিরে আসতে হয় তাঁর আত্মজীবনী না লেখার 'ফৌজদারি অপরাধে'। শুধু আত্মজীবনী কেন, তাঁর কলমের যে ক্ষমতা; সে তুলনায় নিজে লিখেছেন খুব কম। সেটি না হয় মেনে নেওয়া যায় তাঁর তৈরি লেখকদের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু আত্মজীবনী না লেখা!

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটা, নিজ সময় থেকে এগিয়ে থাকা; শুভ ও সুন্দরে আপাদমস্তক কর্ষিত এক মানুষ ছিলেন–তোয়াব খান। নক্ষত্রেরা চুরি করে নিয়ে গেছে। জানি, চরম সত্যের কাছে নত হতে হয় সবাইকে। তাঁর এই চলে যাওয়া স্রেফ প্রস্থান নয়, কালের ধুলোয় কিছু ছাপ রেখে গেছেন তাঁর নীরব চলনের মতোই। যে ছাপ আমি এবং আমার মতো অনেকেই বয়ে বেড়াই হৃদয়ে। বিশ্ব সাহিত্যের শুদ্ধতম কণ্ঠস্বর জেমস জয়েস সম্পর্কে নোবেলজয়ী স্যামুয়েল বেকিট বলেছেন, 'আমাদেরকে না দেখলেও তাঁর চলত; কিন্তু তাঁকে ছাড়া আমরা অচল।' বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় তোয়াব খান প্রসঙ্গে বেকিটের উক্তিটি উচ্চারণ করাই যায়।

জীবনরেখার ওপারে ভালো থাকবেন–এই প্রর্থনা।

রবীন্দ্রনাথ ধার করে বলি:
তোমার আসনখানি, কোলাহল-মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা, নিস্তব্ধে বিরাজে।

দ্রোণাচার্য–আপনার জন্য ভালোবাসা।

লেখক: সহ-সম্পাদক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

কালের অভিযাত্রী

দুলাল আচার্য

সাংবাদিকতার বটবৃক্ষ তিনি। ছিলেন বাংলাদেশের সংবাদপত্রজগতে দ্যুতি ছড়ানো গুণিজন। ব্যক্তিজীবন ছাড়িয়ে যিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি সাংবাদিকতার দিকপাল তোয়াব খান। দেশের জন্য, সাংবাদিকতা পেশার জন্য, মুক্তবুদ্ধি ও সংস্কৃতির জন্য এবং প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডলে এই অসাধারণ মানুষটির উপস্থিতি যেন সর্বক্ষণ।

ত্রিকালদর্শী এক স্বপ্নিল মানুষ ছিলেন তোয়াব খান। ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ ও একজন অসাম্প্রদায়িক বাঙালি। অনিয়ম, দুর্নীতি, মৌলবাদ, জঙ্গিতন্ত্রসহ দেশ ও জাতির স্বার্থবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে তাঁর সাংবাদিকতা ছিল আপসহীন ও তেজোদ্দীপ্ত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল তাঁর ধমনিতে। নিজের মননে যে চেতনা ধারণ করতেন, এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন প্রয়োগে। সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, রিপোর্টিং, ফিচারসহ অন্যান্য পাতায় নিঃসংকোচে লেখা প্রকাশে দিকনির্দেশনা ও উৎসাহ দিতেন। কখনো সক্রিয় রাজনীতি করেননি। তবে রাজনীতির কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যাপক আগ্রহী ছিলেন। তাঁর নীতি ও নৈতিকতা ছিল প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার। সাংবাদিকতার ইতিহাস, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে স্মৃতিময় ঘটনা, স্বাধীনতা-পূর্ব ও পরবর্তী রাজনীতির নানা স্মৃতিময় বহু ঘটনা তাঁর কাছ থেকে শুনেছি বহুবার। সাংবাদিকতার গুণী ব্যক্তি তোয়াব খান সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান ও স্বকীয়তা জীবদ্দশায়ই প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

তাঁর কর্মজীবন ছিল বর্ণাঢ্য। **১৯৫৩** সালে সাপ্তাহিক জনতার মাধ্যমে তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। তবে তাঁর পেশাদারি সাংবাদিকতার শুরু **১৯৫৫** সালে

দৈনিক সংবাদে। ১৯৬১ সালে তিনি দৈনিক সংবাদের বার্তা-সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৬৪ সালে যোগ দেন দৈনিক পাকিস্তানে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শব্দসৈনিকের ভূমিকা পালন করেন। সেসময় তাঁর আকর্ষণীয় উপস্থাপনায় নিয়মিত প্রচারিত হয় 'পিন্ডির প্রলাপ' নামক অনুষ্ঠান। দেশ স্বাধীনের পর দৈনিক পাকিস্তান থেকে বদলে যাওয়া দৈনিক বাংলার প্রথম সম্পাদক ছিলেন তোয়াব খান। ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি তিনি দৈনিক বাংলার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব ছিলেন। পরে তিনি প্রধান তথ্য কর্মকর্তা এবং প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। দৈনিক জনকণ্ঠ প্রকাশের দিন থেকেই প্রায় তিন দশক পত্রিকাটির উপদেষ্টা সম্পাদক ছিলেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি দৈনিক বাংলার সম্পাদক ছিলেন। তবে মানুষের কাছে তাঁর পরিচয় জনকণ্ঠের তোয়াব খান হিসাবেই। ২০১৬ সালে সাংবাদিকতায় অনন্য অবদানের জন্য 'একুশে পদক' পান এই গুণী সাংবাদিক।

জনশ্রুতি বা লোকমুখে তাঁর সম্পর্কে জানাশোনা অনেক আগে হলেও তোয়াব ভাইকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা জানার বিষয়টি স্পষ্ট হয় তাঁর অধীনে কাজ করতে গিয়ে। সময়টা ২০০৯ সাল। জনকণ্ঠে সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদানের প্রথম দিন তাঁর সামনে প্রায় পাঁচ মিনিটের অবস্থানে মনে হলো তিনি খুব কঠিন এবং কম কথা বলার মানুষ। কিন্তু তাঁর সরলতা আর আন্তরিকতার প্রকাশ মেলে খুব অল্প সময়ে। পরে বুঝতে পেরেছি প্রথম দিন যতটা ভয় পেয়েছি, ততটা ভয়ের মানুষ নন তিনি। পরনিন্দা বা কাউকে ছোটো করা কিংবা কাজে অক্ষমতা বা অযোগ্যতাকে কখনো উপহাস করতেন না। বরং উৎসাহ দিতেন, শিখতে সহায়তা করতেন। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় প্রবীণ বয়সেও নবীনসম কর্মদীপ্ততা ছিল তাঁর। লেখা সম্পাদনার ক্ষেত্রে চৌকশ একটা দৃষ্টিভঙ্গি দেখেছি তাঁর মধ্যে, যা যে কোনো সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয়ই নয়, অনুকরণীয়ও বটে।

তিনি প্রায়ই বলতেন, সাংবাদিক হিসাবে দুটো বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, সাংবাদিকের আত্মসচেতনতা এবং নিজের পেশা, পেশার দায়িত্ব এবং এর নীতিমালা মেনে চলার জন্য দৃঢ়সংকল্প। আরেকটা দিক হচ্ছে–এই পেশাটিকে এবং এ পেশার বাহন তা সংবাদপত্রই হোক, রেডিয়ো হোক, টেলিভিশন হোক–একে বিপথে চালানোর জন্য কেউ যেন চেষ্টা করতে না পারে। এ দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে পারলেই আজ সংবাদপত্রের তথা তথ্য বিকাশের যে সুযোগ এসেছে, তা সৎ পথে চলবে। বলতেন, দেশের স্বার্থ আর সাংবাদিকতার স্বার্থ–এ দুটো যেন পরস্পরবিরোধী কখনো না হয়। দেশ যদি না থাকে, তাহলে সাংবাদিকতাও থাকে না। বাংলাদেশের জন্য ৩০ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছেন, কয়েক লাখ মা-বোন কত যে নির্যাতন সহ্য করেছেন, এক কোটি লোক বাস্তুচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। অসংখ্য লোকের কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে একটা দেশ হয়েছে। আমাদের এমন কিছু করা উচিত হবে না, যা নিজের দেশের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়।

তোয়াব খানের সাংবাদিকতা ও জীবনসংগ্রাম আমার সাংবাদিকতা জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি বলতেন, সাংবাদিকতার দায়বদ্ধতা সব সময় পাঠকের কাছে–কোনো সম্প্রদায়, রাজনৈতিক দল বা সরকারের কাছে নয়। সাংবাদিকদের পরীক্ষা দিতে হয় প্রতিদিন। তাই সংবাদ পরিবেশনে অতিমাত্রায় সচেতন হওয়া জরুরি। বলতেন, পাঠক যেমন কাগজের মূল প্রাণ, তেমনই বিশ্লেষক ও বিচারক। আসলে আমার সাংবাদিকতার পরিপূর্ণতা তাঁর কাছেই। ২০০৯ সালে দৈনিক জনকণ্ঠের সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিয়ে প্রথমদিকেই তাঁর নজর কেড়েছিলাম একটি ধারাবাহিক লেখা সম্পাদনা করতে গিয়ে। লেখাটির সম্পাদনার কাজ দেখে তোয়াব ভাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বেশ ভালো করেছ। সব লেখাই এভাবে দেখে ছাড়বে। সেই থেকে বিশ্বাস আর কাজের প্রতি আন্তরিকতায় তোয়াব ভাইয়ের বিশ্বস্ততা অর্জন করি। প্রতিদিন সম্পাদকীয় ও চতুরঙ্গ পাতা দেখাতে গেলে বলতেন, লেখাগুলো তুমি পড়েছ তো? বড়ো লেখা কীভাবে সীমিত শব্দের মধ্যে আনতে হয়, অপ্রয়োজনীয় ও একাধিকবার ব্যবহৃত শব্দ বর্জন করে বিকল্প শব্দের ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। বাক্যের যোগ্যতা হারায়–এমন কোনো শব্দ ব্যবহার না করার কথা বলতেন। অনেক ক্ষেত্রে শব্দ ধরে দেখিয়ে দিতেন। যেদিন আমার সম্পাদকীয় লেখার পালা ছিল, সেদিন সম্পাদকীয়টিতে কোনো অসংগতি থাকলে মার্ক করে পরিবর্তন ও পরিমার্জনের কথা বলতেন। সহজ করে বললে, দৈনিক জনকণ্ঠের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতে গিয়ে নতুনভাবে আমার সাংবাদিকতার হাতেখড়ি ছিল তোয়াব ভাইয়ের কাছে।

২০১৯ সালে আমি দৈনিক জনকণ্ঠ ছেড়ে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এ যোগ দিই। তোয়াব খান চাননি আমি দৈনিক জনকণ্ঠ ছেড়ে আসি। সর্বশেষ তিনি দৈনিক জনকণ্ঠে আমাকে পার্টটাইমও রাখতে চেয়েছিলেন। পিআইবিতে যোগদানের পর তোয়াব ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রায়ই কথা হতো। পিআইবির গণমাধ্যম সাময়িকী নিরীক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ (আমার তীর্থযাত্রা) এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'কী আশ্চর্য সেই ভবিষ্যদ্বাণী' স্মৃতিচারণামূলক তাঁর দুটি লেখা আমরা প্রকাশ করেছিলাম। সর্বশেষ সিনিয়র সাংবাদিক আলী হাবীব ভাইকে দিয়ে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার করিয়ে নিরীক্ষায় প্রকাশ করেছিলাম। তোয়াব ভাইকে নিয়ে আমার ব্যক্তিগত বহু স্মৃতি আজ অমলিন। লেখার পরিসর ছোটো, তাই স্মৃতিময় অনেক ঘটনার প্রকাশ অসমাপ্তই থেকে গেল।

আমার মতো বহু সাংবাদিকের কাছে তোয়াব খান একটি অহংকারের নাম। কারণ, সাংবাদিকতায় তিনি সাধারণ থেকে অসাধারণ। সাংবাদিকতার প্রতিটি স্তরে তিনি প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে পরিণত হয়েছিলেন মহিরুহে।

মানুষ চলে যায়; কিন্তু কোনো কোনো মানুষ সমাজ-রাষ্ট্রে সব সময় বেঁচে থাকেন। তাঁদের প্রতিভা ও অবদান সব সময় তাঁদের বাঁচিয়ে রাখে। তাঁরা বেঁচে থাকেন নিজকর্মে, মানুষের স্মৃতিতে, জীবনের অনুষঙ্গে। তোয়াব খান সেই প্রতিভাবান মানুষদেরই একজন। একজন শারীরিক তোয়াব খানের চলে যাওয়া মানে সব শেষ নয়। কারণ, কর্ম জীবিত মানুষের চেয়েও বেশি জাগ্রত। সাংবাদিকতায় তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে অনন্তকাল। আজও তাঁর বিদায়ের সত্য মানা কঠিন। তোয়াব ভাই হারিয়ে যাওয়ার নন, কারণ তাঁর ব্যাপ্তি গণমাধ্যমব্যাপী–তিনি সাংবাদিকতায় কালের অভিযাত্রী। আমার পরম আপনজন, দেবদূতসম। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার অসংখ্য প্রণতি।

লেখক: সহকারী সম্পাদক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সম্পাদকের বৈঠকে

জাফর ওয়াজেদ

ছিলেন তিনি সম্পাদকেরও সম্পাদক। বাঙালির সাংবাদিকতাজগতে দেদীপ্যমান নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বলে ছিল যাঁর জীবনপ্রবাহ। দক্ষতা, যোগ্যতা, কর্মকুশলতা, কর্মনিষ্ঠা, সততা ও দূরদর্শিতায় দিগন্তজুড়ে ছিলেন তিনি একনিষ্ঠ। আলোর দিকে মুখ রেখে হেঁটেছেন তিনি। অন্ধকারকে পেছনে ফেলে রেখে নয়, বরং আঁধারের পদচ্ছাপগুলো মুছে মুছে তিনি পশ্চাতেও ফেলেছেন আলোর রেখা। যেন আলোকের ঝরনাধারায় ধুইয়ে দিয়েছেন কালিমার সব দিগন্তরেখা। তাঁর সেই আলোয় আলোকিত হয়েছে চারপাশ। সমবেত মানুষজন রেঙে উঠেছে পুষ্পিত ইমেজে। মেধা ও মননের পরিশীলিত ধারায় তিনি প্রস্ফুটিত হয়েছেন যেমন, তেমনই অন্যদের মাঝেও তা সঞ্চারিত করেছেন। কর্মকুশলতা তাঁকে কর্মের ভেতরই আবাহনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করেছে বলেই অনেকটা পথ পাড়ি দিতে পেরেছেন অনায়াসে। বলা হয়, তিনি এমন মানুষ, যাঁর হৃদয়ে ন্যায়বোধ, চিত্তে শুভ চেতনার ফল্গুধারা।

কাজের মধ্য দিয়ে দেখেছি মনেপ্রাণে যেমন, কাজকর্মেও চিরনবীন, চিরতরুণ। ইহলোককে বিদায় দেওয়ারও প্রাকমুহূর্তে ছিলেন সকর্মক। বয়স তাঁকে কাবু করতে পারেনি। বয়স যতই বেড়েছে, ততই হয়েছেন অসাধারণ এবং অভূতপূর্ব উদ্দীপক। সাংবাদিক মর্যাদা নিয়ে জীবন অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে যেমন ছিলেন সক্রিয়, যুদ্ধপরবর্তী দেশগড়ার কাজেও করেছেন

নিজেকে নিবেদিত। সময়ের দাবিকে পূরণ করতে ছিলেন সব সময় সচেষ্ট।

তিনি তোয়াব খান। জন্মেছিলেন ব্রিটিশ শাসনকালে অবিভক্ত বঙ্গে। সাতচল্লিশের দেশবিভাগের শিকারও তিনি। মাতুলালয় পূর্ববঙ্গে, পিত্রালয় পশ্চিমবঙ্গে। মাতুলালয়ে জন্ম বলেই পূর্ববঙ্গেই বেড়ে ওঠা। অল্প বয়সেই সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযোগ ঘটে যায়। মওলানা আকরম খাঁর বংশধর বলেই হয়তো সংবাদপত্রে সংযুক্ত হয়ে পড়া। সাংবাদিকতা, সাংবাদিকতাসংশ্লিষ্ট কাজে নিজেকে রেখেছেন ব্যাপৃত।

তোয়াব খান–এই নামটির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধকালে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত কথিকা পাঠ করতেন তিনি। নিজেই লিখতেন 'পিন্ডির প্রলাপ' শিরোনামের কথিকা। পাকিস্তানি সংবাদপত্র ও বেতারের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচারের বিপরীতে সত্য ভাষণ তুলে ধরতেন। সেসব যে অপপ্রচার ও মিথ্যাচার, তা স্পষ্ট করে তুলতেন। পিন্ডির প্রলাপের অনেক স্ক্রিপ্টই পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। বেতারের নিবিষ্ট শ্রোতা স্কুলছাত্র-জীবনে আমাদের অনুপ্রাণিত করত। নানা তথ্যে তিনি খণ্ডন করতেন পাকিস্তানি একতরফা মিথ্যাচার। যেমন একটি কথিকায় বলেছিলেন, "এবারে জেনারেল সাহেরের ইস্টার্ন কমান্ড একেবারেই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে মুক্তিবাহিনীর গোলা আর বুলেটের আঘাতে আঘাতে। অবস্থা বেগতিক দেখে একদল খুদে ডাকাত রাজাকার শাসক সৃষ্টি করা হলো। যাদেরকে নিউজ উইক পত্রিকা 'রাস্তার বখাটে তস্কর দল' বলে অভিহিত করেছে। পত্রিকাটির মতে, 'অস্ত্র হাতে আছে বলে রাজাকারের দল নিজেদের 'খোদা' বলে মনে করে। যত্রতত্র নিরীহ-নিরস্ত্র জনসাধারণের কাছ থেকে টাকাপয়সা আদায় করছে। যারা তাদের আশ্রয় দিতে বা মেয়েলোক সরবরাহ করতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে হত্যা করেছে গুলি করে। এরপর মুক্তিবাহিনীর দুর্বার অভিযানের সামনে সেনাবাহিনী প্রথমেই ঠেলে দিচ্ছে এসব নির্বোধ রাজাকারের দলকে।' এসব সত্ত্বেও জেনারেল নিয়াজির লম্বা-চওড়া দাবি কেন? নিউজ উইকের মতে, পরাজয়ের গ্লানি কিছুটা লাঘবের জন্য জেনারেলের জল্লাদ বাহিনী নিরীহ-নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে ব্যাপক হারে; চালাচ্ছে লুটতরাজ।"

আরেক কথিকায় তিনি এমনটাই বলেছিলেন যে, 'পশ্চিম পাকিস্তানের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যদি ইতিহাসের পাতা একবার উলটে দেখেন, বাংলার মানুষের রক্তের অক্ষরে লেখা স্বাধীনতার দীপ্ত শপথের নতুন অধ্যায় সেখানে দেখতে পাবেন।' তোয়াব খানের সেই বাণী বাস্তবতায় পূর্ণ হয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক তোয়াব খানের বিশ্লেষণধর্মী কথিকা মুক্তিকামী বাঙালিকে সাহসী দিকনির্দেশনাও দিয়েছিল। তাঁর ভাষ্যে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের দখলমুক্ত করতে বিশ্বে কী ঘটেছে তার রূপরেখা ও চালচিত্র পাওয়া যেত।

সাংবাদিক তোয়াব খান বর্ণাঢ্য এক জীবন কাটিয়েছেন। সাতচল্লিশের দেশবিভাগ, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, পঁচাত্তর-পরবর্তী দেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়া, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, জঙ্গিবাদের উত্থান, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তির ক্ষমতারোহণ মৌলবাদের বিকাশ–তিনি তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকাও রেখেছেন তাঁর সম্পাদিত সংবাদপত্রের কল্যাণেও। হতোদ্যম হওয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না। বিশ্বাস করতেন, সাংবাদিক হিসাবে সব সময় মনে রাখতে হবে–সত্য বা ট্রুথ, এটা হচ্ছে শেষ কথা। যেভাবে হোক, সত্যটাকে সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রেক্ষাপট যাই থাক, মতাদর্শ যাই হোক এবং দেশের অবস্থা যাই ঘটুক, যেভাবে ঘটুক না কেন–আলটিমেটলি একজন সাংবাদিকের কাজ হবে সত্য উদ্‌ঘাটন, সত্যের বিকাশ, সত্যের প্রকাশ, অর্থাৎ সত্যটা সামনে তুলে ধরা–এটাই মূল কথা। এখানে তিনি ছিলেন অবিচল। সত্যপ্রকাশে কখনো দ্বিধান্বিত ছিলেন না। তবে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের সামাজিক দায়বদ্ধতাকেও তিনি গুরুত্ব দিতেন।

সাংবাদিকতা সূত্রে তোয়াব খানের সঙ্গে বছর পাঁচেক কাজ করার সুযোগ পাই। সরাসরি তাঁরই অধীনে সম্পাদকীয় বিভাগে ২০১৪ সাল থেকে। সপ্তাহে ছয়দিন সম্পাদকের বৈঠকে দেখা হতো। কথা হতো নানান বিষয়সহ কাজের বিষয়ে। ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, চলচ্চিত্র, সংগীত, চারুকলা, শিল্পসাহিত্যসহ প্রায় সব বিষয়েই আলোচনা চলত। স্মৃতির মণিকোঠা থেকে তিনি অনেক মূল্যবান জিনিস উপহার দিতেন আলোচনায়। ইতিহাসের খেরো খাতা খুলে যেসব তথ্য-উপাত্ত সামনে নিয়ে আসতেন, তাতে অভিভূত যেমন হতাম, তেমনই তথ্যগত দিক থেকে সমৃদ্ধ হতাম। সাতচল্লিশ-পূর্ব সংবাদপত্রের হালহকিকত থেকে পাকিস্তান-পর্বের সংবাদপত্রের নানা দিগ্‌দিগন্ত উঠে আসত। সামসময়িক সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিকদের নানা প্রসঙ্গ, খবরের ভেতরের খবর উঠে আসত। মহান মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও ১৯৭২-৭৫ সময়কালের অনেক অজানা তথ্য ও ঘটনাকেও সামনে নিয়ে আসতেন, যা আমাকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে।

প্রতিদিন (শুক্রবার ছাড়া) বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত (কখনো কখনো ২টা) সম্পাদকের বৈঠকটি ছিল আকর্ষণীয়। নস্টালজিয়া এসে ভর করত। বঙ্গবন্ধুকে দেখেছেন অন্তরঙ্গ আলোকে, দেশে-বিদেশে হয়েছেন সফরসঙ্গী। স্বাধীনতা-উত্তর সংবাদপত্র পরিস্থিতি, সরকারের ভেতর-বাইরের নানা দিক তিনি তুলে ধরতেন আড্ডার মতো করে। সাগরময় ঘোষের সম্পাদকের বৈঠকে যেমন নানা বিষয়ের গূঢ় অবতারণা হতো, তোয়াব খানের সম্পাদকের বৈঠকটিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ, অজানিত তথ্যের বাহারে সমৃদ্ধ। কথার পিঠে কথা রেখে অনেক বিষয় জানা হতো। এই আড্ডাতেই তিনি মাঝেমধ্যে ডায়ারি লিখতেন। ডায়ারি লেখা ছিল তাঁর নিত্যকার কাজের অংশ। আনন্দবাজারসহ কলকাতার বাংলা ও ইংরেজি কাগজের সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন ছিল তাঁর পাঠের তালিকায়। কিছু চোখ বোলাতেন, কিছু পাঠ করতেন। পাঠ শেষে এগুলো রেফারেন্স সেকশনে পাঠাতেন। অনেক আবার আমাকে দিতেন। সেসব পাঠে সমৃদ্ধ হতাম। তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীর কাজ ছিল সেসব লেখা ডাউনলোড করে প্রিন্ট করা।

তোয়াব খান চলতেন রুটিনমাফিক। সকাল ১০টায় জনকণ্ঠ অফিসে আসতেন। এসেই রিপোর্টারদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করতেন। ২টা নাগাদ বাড়ি যেতেন। বিকাল ৫টায় আবার অফিসে এসে রাত ৮টা-সাড়ে ৮টা পর্যন্ত নিউজ এডিট করতেন নিজেও। তারপর প্রথম সংস্করণের মেকআপ শেষ করে বাড়ি ফিরতেন। প্রচুর বই কিনতেন। দ্রুত পাঠ করার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। তাঁর কাছে অনেক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের তথ্যাদি পেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছি। কথা বলাও যে একটা শিল্প, তা প্রতিমুহূর্তে মনে হতো। সম্পন্ন মানবের প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি আমার কাছে। পোশাক-আশাকও ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্মত। দীর্ঘদেহী মানুষটাকে দূর থেকে দেখা যেত।

তোয়াব খান সম্পাদকের বৈঠকে বলতেন, 'দেশের স্বার্থ আর সাংবাদিকতার স্বার্থ–এ দুটো যেন পরস্পরবিরোধী কখনো না হয়। দেশ যদি না থাকে, সাংবাদিকতাও থাকে না।' পঁচাত্তর-পরবর্তী দেশের পরিস্থিতি তাঁকে পীড়িত করত। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তাঁকে স্বস্তিতে রাখেনি। তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সামনে নিয়ে এসেছেন সব সময়। দৃঢ়তা ও সাহস ছিল অপরিসীম। মুক্তিযোদ্ধা এই সাংবাদিক

যখন দৈনিক জনকণ্ঠে উপদেষ্টা সম্পাদক, তখন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। রিমান্ডেও নিয়েছিল। যে ঘটনা তাঁকে ভীষণভাবে পীড়িত করেছিল। সাহসের বরাভয় কাঁধে তিনি কারামুক্ত হয়ে সারা দেশের মানুষের কাছে খাঁটি সাংবাদিক হিসাবে প্রতিভাত হন।

স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির উত্থান ও আস্ফালনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ছিল তাঁর। নিজের সম্পাদিত পত্রিকা দৈনিক জনকণ্ঠে ধারাবাহিক সিরিজ ছাপা শুরু করেন 'তুই রাজাকার'। রাজাকারনামা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে তা গ্রন্থাকারেও প্রকাশ করেন। বলতেন সম্পাদকের বৈঠকে, 'মনে রাখতে হবে, ৩০ লাখ বাঙালি জীবন দিয়েছে, আরও কয়েক লাখ মা-বোন কত যে নির্যাতন সহ্য করেছেন, তারপর এক কোটি লোক বাস্তুচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। অসংখ্য লোকের কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে একটা দেশ হয়েছে। এখন আমি কি এমন কাজ করব, যেখানে আমার নিজের দেশের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়।'

সংবিধানের মৌলিক নীতির পক্ষে ছিল তাঁর দৃঢ় অবস্থান। অতীত দিনের সাংবাদিক এবং আজকের দিনের সাংবাদিকতার মধ্যে যে ফারাক বা পার্থক্য, তা তিনি তুলে ধরতেন সম্পাদকের বৈঠকে। আজকের দিনে তথ্যের বিকাশ ও তথ্যের প্রবাহ অবাধ হওয়ার যে প্রক্রিয়া তিনি অবলোকন করেছেন, তাতে মনে করতেন, এখনকার সাংবাদিকতার সর্বব্যাপক একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে। ব্যাপক কর্মসংস্থানেরও সুযোগ ঘটেছে। সাংবাদিকতা পেশা যে একটি সম্মানজনক পেশা এবং মানুষকে সেবা করার জন্যই এই পেশা, তা তিনি বারবার স্মরণ করাতেন রিপোর্টার্র বৈঠকে যেমন, তেমনই সম্পাদকীয় বৈঠকেও। সাংবাদিকের আত্মসচেতনতা এবং নিজের পেশা, পেশার দায়িত্ব এবং এর নীতিমালা মেনে চলার জন্য দৃঢ়সংকল্প থাকার বিষয়টিকেও সামনে নিয়ে আসতেন। এই পেশা এবং পেশার বাহনকে, তা যে মাধ্যমই হোক, তা যেন কেউ বিপথে চালানোর চেষ্টা করতে না পারে, সে বিষয়টিও গুরুত্ববহ ছিল তাঁর কাছে।

অল্পবয়সে সাংবাদিকতায় আসা তোয়াব খান ধাপে ধাপে নিজেকে এগিয়ে নিয়েছেন। বার্তা সম্পাদক থেকে সম্পাদক, বঙ্গবন্ধুসহ অন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রেস সচিব, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক এবং প্রধান তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্বও পালন করেছেন।

এটা স্বীকৃত যে, বাংলাদেশে আধুনিক সাংবাদিকতার কিংবদন্তি পথিকৃৎ তোয়াব খান। বাংলাদেশের বহু সম্পাদকের সম্পাদক ছিলেন তিনি। মানুষ হিসাবে ছিলেন নির্মোহ এবং প্রচারবিমুখ। সম্পাদকের বৈঠকে একবার বলেছিলেন, ২৬ মার্চ ১৯৭১। দৈনিক পাকিস্তান প্রকাশনা। তোয়াব খান তখন বার্তা সম্পাদক। এরপর সামরিক জান্তা ও তাদের সহযোগী জামায়াতের হুমকির মুখে তিনি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতারে যোগ দেন। 'জয় বাংলা' পত্রিকায় কলাম লিখতেন। দৈনিক পাকিস্তানের একাত্তরের ২৬ মার্চ সংখ্যাটি সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে প্রকাশ করেছিলেন। সেনাবাহিনী ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্টে আক্রমণ সত্ত্বেও পত্রিকাটি ছাপাখানায় চলে যায়। কিন্তু হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর নানামুখী তৎপরতার কারণে তা আর বিলি পর্যায়ে যেতে পারেনি। ১৯৭৪ সালে তারা পত্রিকাটির শিরোনাম আর মূল বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে প্রথম পৃষ্ঠা ছাপান।

সাংবাদিকতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ছাপ রেখে গেছেন কর্মকুশলতার, সত্যনিষ্ঠতার। সরকারি প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা সত্ত্বেও ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি প্রেস ক্লাবের বিপরীতে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে একটি ছাত্র সংগঠনের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে গুলিতে ছাত্র মারা যায়। এই ঘটনা নিয়ে দৈনিক বাংলা টেলিগ্রাম বের করে, যা নিয়ে বিক্ষোভ হয়। তোয়াব খানকে সরিয়ে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসের নানা পরতে পরতে তোয়াব খানের নাম লিপিবদ্ধ থাকবেই। সংবাদপত্রজগতে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রায় পাঁচ বছর একটানা কাজ করেছি তোয়াব খানের অধীনে সম্পাদকীয় বিভাগে। সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় লেখার ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন আমাকে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন না করার কারণে কোনো লেখাই ফেরত আসেনি। অনেক বিষয়ে অবশ্য পরামর্শ দিতেন সংযোজন ও বিয়োজনের ক্ষেত্রে। তোয়াব খান তাঁর কীর্তির চেয়েও মহীয়ান–একবাক্যে বলা যায়।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও
মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

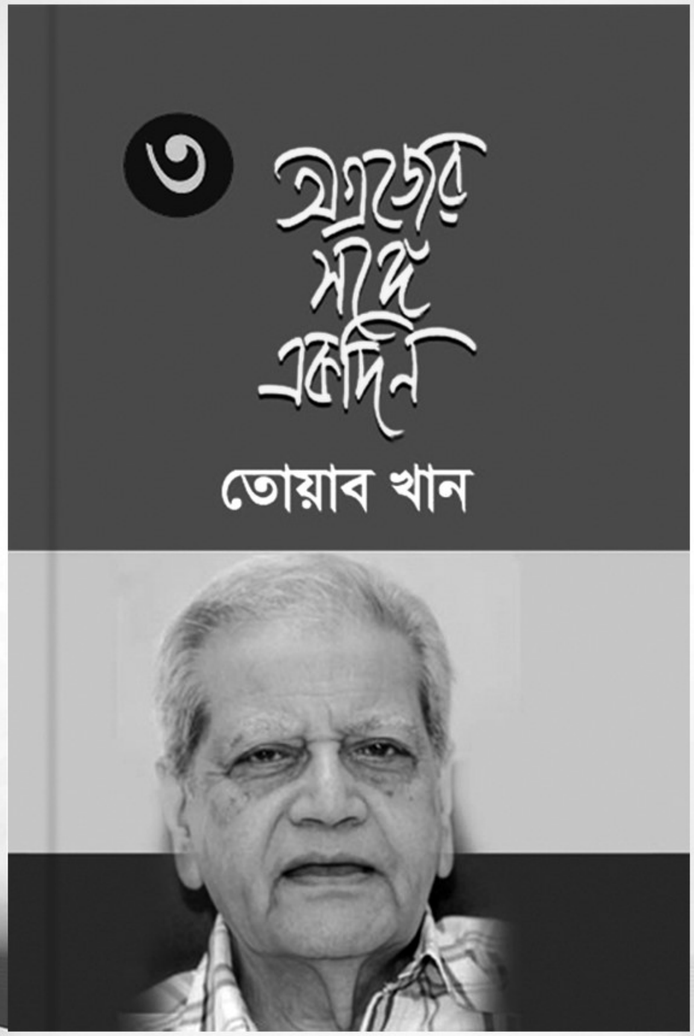

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ মার্চ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শিল্পীদের হাতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তুলে দেন

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুদান বাড়ানো হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জীবনমুখী ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, চলচ্চিত্র মানুষকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। কারণ, মানুষ তার জীবনের প্রতিচ্ছবিটা সেখান থেকে পায়। এ ধরনের সিনেমাই পারে মানুষের জীবন বা সমাজের চিত্র পালটে দিতে। তাই তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান বাড়ানোর উদ্যোগ নেবেন। বরাদ্দ ভালো থাকলে ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণ হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ৯ মার্চ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জীবনধর্মী সৃষ্টির গ্রহণযোগ্যতা সর্বত্র; সিনেমা, নাটক–সব ক্ষেত্রেই অবদান রাখে। এটা মানুষের চিন্তাচেতনায় আরও উৎকর্ষ ঘটাতে এবং অন্যায়-অপরাধ থেকে দূরে রাখতে পারে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, করোনার সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সবকিছুর দাম বেড়ে গেছে। মূল্যস্ফীতি দারুণভাবে বেড়েছে। সেখানে সরকার যে অনুদান দিচ্ছে, এটা একটা পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য যথেষ্ট নয়। এই অনুদান আরও বাড়াতে হবে।

তিনি বলেন, সম্প্রতি আমাদের কিছু আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র দেশের মানুষ লুফে নিয়েছে। দেশের সীমানা পেরিয়ে বাইরেও সেগুলোর চাহিদা রয়েছে। তিনি কষ্ট করে দেশের

সিনেমাশিল্পকে এগিয়ে নেওয়ায় কলাকুশলীসহ সংশ্লিষ্টদের সাধুবাদ জানানোর পাশাপাশি এফডিসিতে কমপ্লেক্স তৈরির কাজের ধীরগতিতে উষ্মা প্রকাশ করেন এবং তা দ্রুত শেষ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

গাজীপুরে নির্মাণাধীন ফিল্মসিটি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, তাঁর সরকার ফিল্ম আর্কাইভ এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করে দিয়েছে। এখন প্রশিক্ষণ জরুরি।

শেখ হাসিনা বলেন, একসময় ছিল অশ্লীল সিনেমা, মারদাঙ্গা বা শুধু অনুকরণ করা। সেগুলো না করে ভালো জিনিস শিখে নেওয়া আর মন্দ জিনিস পরিহার করা দরকার। সমাজের জন্য কোনটা ভালো, সেটা বিবেচনায় নিতে হবে। এমন সিনেমা দরকার, যা বাবা-মা, ভাই-বোন, সবাই মিলে দেখতে পারে।

তিনি এ সময় শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আমরা এ বিষয়টায় একটু পিছিয়ে আছি। এক্ষেত্রে আরও চলচ্চিত্র নির্মাণ করা উচিত। এ ধরনের চলচ্চিত্র যারা নির্মাণ করবেন, তাদের জন্য অনুদান আরও ভালোভাবে দেওয়া দরকার।

পুরোনো চলচ্চিত্র, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলো যেন হারিয়ে না যায়, সেজন্য এগুলো ডিজিটালাইজড করে নতুনভাবে প্রদর্শনের উদ্যোগ নেওয়ার ওপরও তিনি জোর দেন।

প্রধানমন্ত্রী ২৭টি ক্যাটাগরিতে ৩৪টি পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে তুলে দেন। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু ও সচিব হুমায়ুন কবীর খোন্দকার। পুরস্কারপ্রাপ্তদের পক্ষে আজীবন সম্মাননাপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ডলি জহুর বক্তব্য দেন। সূত্র: ১০ মার্চ ২০২৩, সমকাল

রাজধানীর সেগুনবাগিচাস্থ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনে সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভায় অতিথিদের সঙ্গে ক্র্যাব মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা

ক্র্যাবের বার্ষিক সভায় ডেপুটি স্পিকার

জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু বলেছেন, ক্লুলেস অপরাধ চিহ্নিত করতে সাংবাদিকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ক্রাইম রিপোর্টারদের দায়িত্ব অনেক বেশি। ৯ জানুয়ারি রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে ক্র্যাব মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২২ প্রদান করা হয়। এবার মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন সমকালের বিশেষ প্রতিনিধি সাহাদাত হোসেন পরশসহ ছয়জন। মাদক কারবারের আর্থিক নেটওয়ার্ক নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য পরশ এ পুরস্কার পান। ২৮ সেপ্টেম্বর সমকালে ‘মোবাইল ব্যাংকিংয়ে মাদকের টাকা’ শীর্ষক অনুসন্ধানী প্যাকেজ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রথম আলোর নুরুল আমিন, ঢাকা পোস্ট ডটকমের আদনান রহমান, মাছরাঙা টেলিভিশনের আবু জাহেদ মুহা. সেলিম, দৈনিক বাংলার নুরুজ্জামান লাবু, ডেইলি স্টারের মোহাম্মদ জামিল খান পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

ক্র্যাব সভাপতি মির্জা মেহেদী তমালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত আইজিপি ব্যারিস্টার হারুন অর রশিদ বলেছেন, পুলিশ ও সাংবাদিক একে অপরের পরিপূরক। পুলিশ যেভাবে জীবনবাজি রেখে কাজ করে, ঠিক সেভাবেই সাংবাদিকরা কাজ করেন। আরও বক্তব্য দেন র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন এবং ক্র্যাব সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বিকু। (সূত্র: ১০ জানুয়ারি ২০২৩, সমকাল)

অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার পেলেন শাহ্‌নাজ মুন্নী

সাহিত্যে গভীর জীবনদর্শনের প্রতিফলন ঘটিয়ে ভিন্ন ধারা সৃষ্টি করে এবার ‘অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার ১৪২৯’ পেলেন কবি, কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক শাহ্‌নাজ মুন্নী। তাঁর অগ্রজ, অনুজ কথাসাহিত্যিকদের মতে, ৩০ বছরের সাহিত্যচর্চায় শাহ্‌নাজ মুন্নী তিলে তিলে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। তার লেখায় নারীবাদের ক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর প্রতিপক্ষ না করে সমকক্ষ হিসাবে হাজির করেছেন।

গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ৪ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে পাক্ষিক অনন্যা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

১৪০১ বঙ্গাব্দে (১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) ‘অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার’ প্রবর্তন করা হয়। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে প্রতিবছর একজন কৃতী নারী সাহিত্যিক অথবা সাহিত্য গবেষককে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, শাহ্‌নাজ মুন্নী তাঁর কবিতায় ক্রুদ্ধ এক অন্ধকারের গল্প বলেছেন, হেঁটেছেন হৃদয়ঘরের বারান্দায়। কলমের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন নতুন ভুবন। এই বিশাল পথে তাঁর সঙ্গী শুধু শব্দ। এ পর্যন্ত শাহ্‌নাজ মুন্নীর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২৪টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ‘এলো ক্রুদ্ধ অন্ধকার’, ‘বাদুর ও ব্র্যান্ডি’, ‘তৃতীয় ঘণ্টা পড়ার আগেই’, ‘পান সুন্দরী’, ‘নির্বাচিত গল্প’,

'আমি আর আমিন যখন আজিমপুর থাকতাম'।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক আনোয়ারা সৈয়দ হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন কথাসাহিত্যিক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হামীম কামরুল।

পুরস্কার পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় শাহ্‌নাজ মুন্নী জানান, সাহিত্যে এটা তাঁর প্রথম আনুষ্ঠানিক পুরস্কার। তবে দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও অনুপ্রেরণার অনেক অনানুষ্ঠানিক পুরস্কার জমেছে তাঁর। বাংলাদেশের নারীদের অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে চলতে হয়, সামাজিক সব দায়িত্ব ও কর্তব্য নারীর ওপর চাপানো হয়। সেসব পালন করে একজন নারী সাহিত্যচর্চায় অংশ নিতে পারেন। তিনি লেখার মাধ্যমে আনন্দ খুঁজে পান। সাহিত্যচর্চা তিনি আজীবন চালিয়ে যেতে চান। সভাপ্রধানের বক্তব্যে পাক্ষিক অনন্যা ও দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তাসমিমা হোসেন বলেন, ভালো মনের চর্চায় বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। (সূত্র: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, প্রথম আলো)

তিন সাংবাদিক পেলেন টিআইবি পুরস্কার

দুর্নীতিবিরোধী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় টিআইবি পুরস্কার পেয়েছে জাতীয় পত্রিকা ক্যাটাগরিতে তিন সাংবাদিক এবং চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সার্চলাইট টিম। ২০২২ সালের ৯ ডিসেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন 'জান্নাতী প্যালেস' টিআইবির অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পুরস্কার পেয়েছে। সাংবাদিক আবদুল্লাহ আল ইমরানের করা প্রতিবেদনের জন্য চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সার্চলাইট টিম এ পুরস্কার পায়।

সাংবাদিক আবদুল্লাহ আল ইমরান ও সার্চলাইট টিমের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পরে এক প্রতিক্রিয়ায় আবদুল্লাহ আল ইমরান বলেন, 'ধারাবাহিকভাবে ভালো সংবাদ প্রচারের স্বীকৃতি পেল টিম সার্চলাইট। ডেটা জার্নালিজমের একটি চমৎকার উদাহরণ হতে পারে জান্নাতী প্যালেস প্রতিবেদনটি।'

সার্চলাইট ছাড়াও এ বছর টিআইবির পুরস্কার পেয়েছেন জাতীয় পত্রিকা ক্যাটাগরিতে প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আসাদুজ্জামান, টেলিভিশন ক্যাটাগরিতে যমুনা টিভির অনুসন্ধানী সেলের প্রধান অপূর্ব আলাউদ্দিন এবং আঞ্চলিক ক্যাটাগরিতে খুলনার দৈনিক পূর্বাঞ্চল পত্রিকার সাংবাদিক আবুল হাসান হিমালয়। পুরস্কার হিসাবে সম্মাননাপত্র, ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ দেওয়া হয়। (সূত্র: ১০ ডিসেম্বর ২০২২, সমকাল)

'শাহ আলমগীর জার্নালিজম এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' পেলেন বদরুল আহসান

প্রয়াত সাংবাদিক শাহ আলমগীরের স্মৃতির সম্মানে 'শাহ আলমগীর জার্নালিজম এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' প্রবর্তন করেছে 'ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার' (বিজেসি)। প্রথমবার দেওয়া এ পুরস্কার পেয়েছেন লেখক ও সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান। ৪ মার্চ রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার দেওয়া হয়।

পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেন জুরি বোর্ডের সদস্য সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল। সৈয়দ বদরুল আহসান দেশের বাইরে থাকায় তাঁর পক্ষে পুরস্কার নেন তাঁর ছোট ভাই ও বোন। জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জুরি বোর্ডের সদস্য ও প্রথম আলোর যুগ্মসম্পাদক ও কবি সোহরাব হাসান, জুরি বোর্ডের সদস্যসচিব শাকিল আহমেদ ও শাহ আলমগীরের সহধর্মিণী ফৌজিয়া মায়া।

সৈয়দ বদরুল আহসান লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। তিনি দ্য নিউ নেশন, বাংলাদেশ অবজারভার, দ্য মর্নিং সান, নিউজ টুডে, নিউ এজ, সাপ্তাহিক ঢাকা কুরিয়ার, দ্য ডেইলি স্টার, ডেইলি অবজারভার, এশিয়ান এজ পত্রিকায় বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন।

বিজেসির নেতারা জানিয়েছেন, প্রতিবছর দেশের একজন বরেণ্য সাংবাদিককে শাহ আলমগীর জার্নালিজম এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। এ সম্মাননা পেতে কাউকে আবেদন করতে হবে না। সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখা একজনকে জুরি বোর্ড মনোনীত করবে। (সূত্র: ৫ মার্চ ২০২৩, প্রথম আলো)

ইআরএফ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১৪ সাংবাদিক

'ইআরএফ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড-২০২২' পেলেন ১৪ সাংবাদিক। অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এ পুরস্কার দিয়েছে। এ বছরের সেরা প্রতিবেদন পুরস্কারের আটটি শ্রেণির মধ্যে ছয়টিতেই বিজয়ী হয়েছেন প্রথম আলোর পাঁচজন সাংবাদিক। এর মধ্যে প্রথম আলোর দুজনের প্রতিবেদন পৃথক দুই শ্রেণিতে যৌথভাবে সেরা হয়।

রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে ১৩ ডিসেম্বর বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশের সহযোগিতায় এ পুরস্কার দিয়েছে ইআরএফ। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিকাশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) কামাল কাদীর।

রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবির কার্যালয়ে ৯ ডিসেম্বর ২০২২ অতিথিদের সঙ্গে দুর্নীতিবিরোধী অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পুরস্কারপ্রাপ্তরা

রাজধানীর কেআইবি মিলনায়তনে ইআরএফ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড-২০২২ বিজয়ীদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা

সেরা প্রতিবেদনের জন্য প্রথম আলোর বিজয়ী সাংবাদিকরা হলেন পুঁজিবাজার শ্রেণিতে বিশেষ প্রতিনিধি ফখরুল ইসলাম, রাজস্ব খাতে জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জাহাঙ্গীর শাহ, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে আরিফুর রহমান ও কৃষি অর্থনীতিতে সানাউল্লাহ সাকিব। এছাড়া বেসরকারি খাতে সেরা প্রতিবেদনের জন্য যৌথভাবে পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক শুভংকর কর্মকার ও জাহাঙ্গীর শাহ। ব্যাংক ও বিমা শ্রেণিতে যৌথভাবে পুরস্কার পেলেন প্রথম আলোর সানাউল্লাহ সাকিব ও দৈনিক বাংলার মৌসুমী ইসলাম।

আরও পুরস্কার পেয়েছেন ইংরেজি দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের দৌলত আক্তার, বেসরকারি টেলিভিশন এনটিভির হাসানুল আলম, যমুনা টেলিভিশনের আলমগীর হোসাইন, নিউজ টোয়েন্টিফোরের বাবু কামরুজ্জামান, ঢাকা পোস্টের শফিকুল ইসলাম ও নিউজবাংলা টোয়েন্টিফোর ডটকমের শাহ আলম খান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন বিকাশের প্রধান যোগাযোগ কর্মকর্তা মাহফুজ সাদিক, ইআরএফ সভাপতি শারমিন রিনভী ও সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিচারকমণ্ডলীর সদস্যসহ ইআরএফের সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। (সূত্র: ১৪ ডিসেম্বর ২০২২, প্রথম আলো)

বিশ্ব বেতার দিবস

১৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বেতার দিবস। 'বেতার ও শান্তি' প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশেও বিশ্ব বেতার দিবস পালিত হয়। রাজধানীতে ১৩ ফেব্রুয়ারি দুপুর দেড়টায় র‍্যালি, বিকাল ৩টায় শ্রোতা সম্মেলন হয়। বিকাল ৪টায় আলোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার ও ইউনেস্কোর ঢাকা কার্যায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুসান মেরি ভিজ। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় বেতার ভবনে। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন।

বাংলাদেশ বেতার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন দেশের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। বেতারের যাত্রা শুরু হয় ব্রিটিশ শাসনামলের ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এর ৩২ বছরের মাথায় একই দিনে বিজয় লাভের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশ। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১২ সাল থেকে দেশে বিশ্ব বেতার দিবস পালিত হচ্ছে। (সূত্র: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, সমকাল)

ভারতীয় সাংবাদিক প্রতিনিধিদলকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সংবর্ধনা

বাংলাদেশ সফররত ভারতীয় সাংবাদিক প্রতিনিধিদলকে ৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত এ সংবর্ধনায় ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৩৬ জন সাংবাদিক অংশ নেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে ভারতীয় সাংবাদিকদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য দেন ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন ও সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত। ভারতীয় সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশীষ সুর ও গোয়াহাটি প্রেস ক্লাবের সদস্য মনোজ গোস্বামী।

এ সময় জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্য এবং বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। (সূত্র: ৯ জানুয়ারি ২০২৩, সমকাল)

এলডিডিপি জার্নালিস্ট অ্যাওয়ার্ড

প্রাণিসম্পদ খাতের সম্ভাবনা, সমস্যা ও করণীয় বিষয়ে গবেষণাধর্মী প্রতিবেদনের জন্য

মুন্না রায়হানের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম

সরকারের 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের (এলডিডিপি)' এলডিডিপি জার্নালিস্ট ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ডে প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন দৈনিক ইত্তেফাকের মুন্না রায়হান। ১৮ জানুয়ারি রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এ পুরস্কার তুলে দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। একসময় কোরবানির জন্য ভারত-মিয়ানমারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো। এখন আমাদের প্রাণিসম্পদের উৎপাদন এত বেড়েছে যে, আমরা বিদেশে রপ্তানি করার পর্যায়ে পৌঁছে গেছি।' শ ম রেজাউল করিম বলেন, 'গণমাধ্যমের সহযোগিতা এ খাতকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ করে দিচ্ছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহের যুগে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করতে চাই।' প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মো. এমদাদুল হক তালুকদারের সভাপতিত্বে এবং পরিপ্রেক্ষিতের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ বোরহান কবীরের সঞ্চালনায় এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এলডিডিপি প্রকল্পের পরিচালক মো. আব্দুর রহিম, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল, গ্লোবাল টেলিভিশনের সিইও সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা এবং এলডিডিপি প্রকল্পের প্রধান কারিগরি সমন্বয়ক ড. গোলাম রব্বানী।

গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাস্তবায়নাধীন এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় দেশের ২১ জন গণমাধ্যমকর্মীকে 'এলডিডিপি জার্নালিস্ট ফেলোশিপ' দেওয়া হয়। ১৮ জানুয়ারি নির্বাচিত ফেলোদের প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

প্রিন্ট ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় হয়েছেন ভোরের ডাকের বায়েজীদ মুন্সী এবং তৃতীয় হয়েছেন দেশ রূপান্তরের উম্মুল ওয়ারা সুইটি। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের ফয়জুল সিদ্দিকী, আরটিভির সেলিম মালিক ও ডিবিসির ইউসুফ আলী। এছাড়া অনলাইন ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে জাগো নিউজের ইসমাইল হোসাইন রাসেল, বার্তা টোয়েন্টিফোর ডটকমের তরিকুল ইসলাম সুমন ও ঢাকা পোস্টের শাহাদাত হোসেন রাকিব। জার্নালিস্ট ফেলোশিপ প্রোগ্রাম আয়োজনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে বেসরকারি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান 'পরিপ্রেক্ষিত'। (সূত্রঃ ১৯ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক)

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত

জাতীয় প্রেস ক্লাব ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন (২০২৩-২০২৪) ৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি পদে ফরিদা ইয়াসমিন আবারও নির্বাচিত হয়েছেন। নতুন সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন শ্যামল দত্ত। তাঁরা দুজনই একই প্যানেল (ফরিদা ইয়াসমিন-শ্যামল দত্ত) থেকে নির্বাচন করেছিলেন।

সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ শেষে রাতে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। অন্য পদের মধ্যে সিনিয়র সহসভাপতি পদে সবুজ-ইলিয়াস পরিষদের হাসান হাফিজ পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সহসভাপতি পদে ফরিদা-শ্যামল পরিষদের রেজোয়ানুল হক, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক পদে আইয়ুব ভূঁইয়া ও মো. আশরাফ আলী এবং কোষাধ্যক্ষ পদে শাহেদ চৌধুরী নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়া ব্যবস্থাপনা কমিটির ১০টি সদস্য পদের মধ্যে সবুজ-ইলিয়াস পরিষদের ৬ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন কাজী রওনক হোসেন, সৈয়দ আবদাল আহমদ, বখতিয়ার রানা, শাহনাজ বেগম, সীমান্ত খোকন ও মোহাম্মদ মোমিন হোসেন। সদস্য পদে ফরিদা-শ্যামল পরিষদের তিনজন নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন ফরিদ হোসেন, কল্যাণ সাহা ও শাহনাজ সিদ্দিকী। এছাড়া সদস্য পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী জুলহাস আলম নির্বাচিত হয়েছেন। (সূত্রঃ ১ জানুয়ারি ২০২৩, প্রথম আলো)

বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সাধারণ সম্পাদক বোরহান

বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৩-২০২৪ সেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি পদে ইন্দ্রজিৎ কুমার ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে কাজী বোরহান উদ্দিন নির্বাচিত হয়েছেন। ৬ জানুয়ারি পুরানা পল্টনে সংগঠনটির নিজ কার্যালয়ে এ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। কমিটিতে সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন নাসিম সিকদার ও জহির উদ্দিন আহাম্মেদ সাইমন।

অন্য পদে নির্বাচিতরা হলেনঃ যুগ্ম সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন বাদল ও বাবুল তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল আজিজ ফারুকী, সাংগঠনিক সম্পাদক মোবারক হোসেন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মমীন, দপ্তর সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে এম খোকন সিকদার। এছাড়া নির্বাহী সদস্যরা হলেন আল আমিন লিয়ন, মো. মহুবার রহমান, মশিউর রহমান সুমন ও এসএ মাসুদ। (সূত্রঃ ৭ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক)

ক্র্যাবের সভাপতি তমাল সম্পাদক মামুন

বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) ২০২৩ সালের কার্যনির্বাহী কমিটির

নির্বাচনে মির্জা মেহেদী তমাল সভাপতি ও মামুনুর রশীদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ১০ জানুয়ারি সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে দিনভর ভোটগ্রহণ শেষে নবনির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিনিয়র সাংবাদিক পারভেজ খানসহ চার সদস্যের নির্বাচন কমিশন।

এছাড়া সহসভাপতি মিজানুর রহমান ওরফে মাসুম মিজান, যুগ্মসম্পাদক রুদ্র মিজান, অর্থ সম্পাদক এমদাদুল হক খান, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ারুল হক বকুল (বকুল আহমেদ), প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এসএম ফয়েজ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবু জাফর, কল্যাণ সম্পাদক ওয়াসিম সিদ্দিকী এবং আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে তানভীর হাসান নির্বাচিত হয়েছেন।

অন্যদিকে দপ্তর সম্পাদক কামাল হোসেন তালুকদার, প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক হিসাবে ইসমাঈল হুসাইন ইমু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

কার্যনির্বাহী সদস্যের তিনটি পদে প্রথম হয়েছেন আবদুল্লাহ আল মামুন, দ্বিতীয় জসীম উদ্দীন এবং তৃতীয় এনামুল কবীর রুপম। তাঁরা সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। তবে ক্রম নির্ধারণের জন্য এ পদেও ভোট হয়। (সূত্রঃ ১১ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক)

সাংবাদিক সমবায় সমিতি
সভাপতি সদরুল সম্পাদক দোলন

ঢাকা সাংবাদিক সমবায় সমিতির নতুন কমিটি গঠন হয়েছে। ২০২৩ সালের জন্য করা এ কমিটিতে ইউএনবির সিনিয়র রিপোর্টার সদরুল হাসান সভাপতি এবং বাংলাদেশ প্রতিদিনের সিনিয়র রিপোর্টার শফিউল আলম দোলন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ২২ জানুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবে সমিতির পরিচালনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের কমিটিতে তারিফ রহমান সহসভাপতি, সালাউদ্দিন বাবলু যুগ্ম সম্পাদক ও নুরুল হুদা কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া এমএম জিয়াউর রহমান, জহিরুল হক রানা, গোলাম মোস্তফা, মাসুম বিল্লাহ, রফিকুল ইসলাম আজাদ ও শহিদুল ইসলামকে সদস্য করা হয়েছে। (সূত্রঃ ২৩ জানুয়ারি ২০২৩, সমকাল)

ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত সাধারণ সম্পাদক কাশেম

অর্থ ও বাণিজ্য বিটের সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দ্য ডেইলি স্টারের সিনিয়র রিপোর্টার রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। সাধারণ সম্পাদক বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের বিশেষ প্রতিনিধি আবুল কাশেম।

২৩ ডিসেম্বর পুরানা পল্টনে সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে দ্বিবার্ষিক সভা এবং ২০২৩-২৪ মেয়াদের পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সালাউদ্দীন বাবলু, সহসাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান এবং অর্থ সম্পাদক রহিম শেখ। সদস্য পদে বিজয়ী ফরহাদ হোসেন তালুকদার, বদিউল আলম মজুমদার, সাইফুল ইসলাম ও শাহ আলম নূর। (সূত্রঃ ২৪ ডিসেম্বর ২০২২, কালের কণ্ঠ)

র‍্যাকের সভাপতি ফয়েজ সাধারণ সম্পাদক জেমসন

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স অ্যাগেইনস্ট করাপশনের (র‍্যাক) কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউ এজের সিনিয়র রিপোর্টার আহম্মদ ফয়েজ সভাপতি এবং একাত্তর টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার জেমসন মাহবুব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

২৩ ডিসেম্বর রাজধানীর সেগুনবাগিচার একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ভোটের মাধ্যমে র‍্যাকের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করেন। সংগঠনটির সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক ব্যাংক বীমা ও অর্থনীতির আবুল কাশেম এবং দৈনিক নবরাজের রফিক উজ্জামান। যুগ্মসাধারণ সম্পাদক পদে এশিয়ান টিভির সাফি উদ্দিন আহমেদ, কালের কণ্ঠের হাসিব বিন শহিদ এবং মাই টিভির মাহবুব সৈকত। দ্য বিজনেস পোস্টের সোলাইমান সালমান সাংগঠনিক সম্পাদক, নিউজ টোয়েন্টিফোরের তাসলিমুল আলম তৌহিদ কোষাধ্যক্ষ, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোরের সৈয়দ রিয়াদ দপ্তর সম্পাদক, আরটিভির আতিকার রহমান প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, আজকের পত্রিকার মারুফ কিবরিয়া প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক, বশির হোসেন খান কল্যাণ সম্পাদক এবং নিউজ টোয়েন্টিফোরের আলী তালুকদার সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। (সূত্রঃ ২৪ ডিসেম্বর ২০২২, কালের কণ্ঠ)

পাঁচ সাংবাদিক পেলেন সেরা করদাতা সম্মাননা

এবারও সেরা করদাতার সম্মাননা পেল মিডিয়াস্টার লিমিটেড। মিডিয়াস্টার থেকে দৈনিক প্রথম আলো প্রকাশিত হয়। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া শ্রেণিতে টানা সপ্তমবারের মতো দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী ট্রান্সকম গ্রুপের প্রতিষ্ঠান মিডিয়াস্টার লিমিটেডকে সর্বোচ্চ করদাতা প্রতিষ্ঠানের এই সম্মাননা দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। একই সঙ্গে ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহনাজ রহমান সেরা নারী করদাতার পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া সাংবাদিক শ্রেণিতে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান ও ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম সেরা করদাতা হিসাবে সম্মাননা পেয়েছেন।

২৮ ডিসেম্বর রাজধানীর বেইলি রোডের অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে এনবিআর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট ও কর কার্ড তুলে দেওয়া হয়। শাহনাজ রহমানের পক্ষে সম্মাননা ক্রেস্ট ও কর কার্ড গ্রহণ করেন ট্রান্সকম লিমিটেডের

সাংবাদিক শ্রেণিতে সেরা করদাতা (বাঁ থেকে) চ্যানেল আইয়ের এমডি ফরিদুর রেজা, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, চ্যানেল আইয়ের পরিচালক শাইখ সিরাজ, বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর সম্পাদক নঈম নিজাম এবং দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনামের পক্ষে সম্মাননা নেওয়া প্রতিষ্ঠানটির হেড অব করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ট্যাক্স এ এস এম নজরুল ইসলাম। ২৮ ডিসেম্বর ঢাকার অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে ছবিঃ প্রথম আলো

প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) মো. কামরুল হাসান। শাহনাজ রহমানও টানা সপ্তমবার এই সম্মাননা পেলেন।

শাহনাজ রহমান ট্রান্সকম গ্রুপের সাবেক চেয়ারম্যান প্রয়াত লতিফুর রহমানের স্ত্রী। এর আগে ২০১৭ সালে এনবিআরের পক্ষ থেকে দীর্ঘ সময় ধরে কর দিচ্ছে–এমন ৮৪টি পরিবারকে ‘কর বাহাদুর’ পরিবারের সম্মাননা দেওয়া হয়। তখন লতিফুর রহমান ও তাঁর পরিবার ‘কর বাহাদুর’ পরিবারের সম্মাননা পান।

অনুষ্ঠানে এনবিআরের চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিমের কাছ থেকে মাহ্‌ফুজ আনামের পক্ষে দ্য ডেইলি স্টার-এর হেড অব করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ট্যাক্স এএসএম নজরুল ইসলাম ক্রেস্ট গ্রহণ করেন। অন্যদিকে মিডিয়াস্টারের পক্ষে মতিউর রহমান এই সম্মাননা নেন।

সাংবাদিক শ্রেণিতে এ বছর সেরা করদাতা হয়েছেন মোট পাঁচজন। মাহ্‌ফুজ আনাম ও মতিউর রহমান ছাড়া অন্য তিনজন হলেন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা, একই টেলিভিশনের পরিচালক ও বার্তাপ্রধান শাইখ সিরাজ এবং বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর সম্পাদক নঈম নিজাম। তাঁরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই সম্মাননা গ্রহন করেন।

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া শ্রেণিতে সেরা করদাতা হয়েছে মিডিয়াস্টার লিমিটেডসহ চার প্রতিষ্ঠান। অন্য তিন প্রতিষ্ঠান হলো ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড, সময় মিডিয়া লিমিটেড ও টাইমস মিডিয়া লিমিটেড। ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়ার অধীনে দৈনিক কালের কণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিনসহ একাধিক দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন সংবাদমাধ্যম, টেলিভিশন ও রেডিয়ো রয়েছে। সময় মিডিয়ার আওতায় সময় টেলিভিশন এবং টাইমস মিডিয়ার আওতায় বাংলা দৈনিক সমকাল ও টেলিভিশন চ্যানেল টোয়েন্টিফোর প্রকাশিত ও পরিচালিত হয়। টাইমস মিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এ কে আজাদ ক্রেস্ট নেন।

ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহনাজ রহমান ছাড়াও নারী শ্রেণিতে আরও চারজন এ বছর সেরা করদাতা হয়েছেন। তাঁরা হলেন আনোয়ারা হোসেন, আমিনা আহমেদ, তাসমীন মাহমুদ ও পারভীন হাসান। নারী শ্রেণিতে সেরা করদাতা নির্বাচিত পাঁচজনই ঢাকার করদাতা।

অনুষ্ঠানে ২০২১-২২ কর বছরের জন্য সাংবাদিকসহ ১৪১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এতে সভাপতিত্ব করেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা রহমাতুল মুনিম। (সূত্রঃ ২৯ ডিসেম্বর ২০২২, প্রথম আলো)

বিশ্বব্যাপী সাংবাদিক হত্যা বেড়েছে

বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের নিরাপত্তায় মারাত্মক অবনতির সাক্ষী হয়েছে ২০২২ সাল। এ বছর বিশ্বে অন্তত ৬৭ সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মী নিহত হয়েছেন। এ সময় সাংবাদিক হত্যার ঘটনা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। সাংবদিকদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার বৈশ্বিক সংগঠন কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টসের (সিপিজে) ২৪ জানুয়ারি প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২২ সালে হত্যার শিকার ৬৭ সাংবাদিকের মধ্যে অর্ধেকের বেশি (৩৫ জন) ইউক্রেন, মেক্সিকো ও হাইতি–এই তিন দেশে। এর মধ্যে ইউক্রেনে ১৫ জন, মেক্সিকোয় ১৩ জন হাইতিতে ৭ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, ফিলিপাইন, ইকুয়েডর, গুয়েতেমালা, হন্ডুরাস, কেনিয়া, কাজাখস্তান, তুরস্ক, সোমালিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, প্যারাগুয়ে, মিয়ানমারসহ বিভিন্ন দেশে সাংবাদিক হত্যার শিকার হয়েছেন। (সূত্রঃ ২৬ জানুয়ারি ২০২২, প্রথম আলো)

ফটোসাংবাদিকদের তোলা বহু ছবি কালের সাক্ষী

–তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

ফটোসাংবাদিকদের বহু ছবি ইতিহাস ও কালের সাক্ষী হয়ে আছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। তিনি বলেন, তাঁরা সমসাময়িক কাল ও ইতিহাসকে ধারণ করেন। তাঁদের তোলা এমন ছবি আছে, যেগুলো পৃথিবীকে ভাবায়; মানুষের তৃতীয় নয়ন খুলে দেয়। তাঁদের বহু ছবি আমাদের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

৬ মার্চ সচিবালয়ে বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত কমিটির সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, সিরিয়ার উপকূলে শরণার্থী এক শিশুর নিথর দেহের ছবি সারা বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছে। যখন কোনো দৈবদুর্বিপাক হয়, তখন ফটোসাংবাদিক সেখানে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছবি তোলেন। অনেক সময় একটি ছবির

জন্য অনেকক্ষণ, অনেকদিন, অনেক মাস অপেক্ষা করতে হয়–এমন ঘটনাও আছে। ফটোসাংবাদিকদের কাজটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফটোজার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রী ইন্দ্রজিৎ কুমার ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক কাজী বোরহান উদ্দিনসহ সংগঠনের শীর্ষ নেতারা। (সূত্র: ৭ মার্চ ২০২২, সমকাল)

সাংবাদিকতায় একুশে পদক পেলেন প্রয়াত শাহ আলমগীর

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সাবেক মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর এ বছর একুশে পদক (মরণোত্তর) পেয়েছেন। ২০ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'একুশে পদক-২০২৩' দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং দুটি প্রতিষ্ঠানের মাঝে পদক বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মো. শাহ আলমগীরের জন্ম ১৯৫৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। বাবা আবু ইউসুফ সরকার, মা জোবেদা খাতুন। পৈতৃক আদিনিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার দুরুইল গ্রামে। তাঁর বাবা পরে ঢাকার গোড়ানে স্থায়ী হন।

দীর্ঘ ৩৫ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে মো. শাহ আলমগীর একাধিক ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সাপ্তাহিক কিশোর বাংলা পত্রিকায় যোগদানের মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিকতা জীবন শুরু। এরপর তিনি কাজ করেন দৈনিক জনতা, বাংলার বাণী, আজাদ ও সংবাদে। প্রথম আলো প্রকাশের সময় থেকেই তিনি পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

পরে চ্যানেল আইয়ে প্রধান বার্তা সম্পাদক, একুশে টেলিভিশনে হেড অব নিউজ, যমুনা টেলিভিশনে পরিচালক (বার্তা) এবং মাছরাঙা টেলিভিশনে বার্তাপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ২০১৩ সালের ৭ জুলাই পিআইবির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পান মো. শাহ আলমগীর। মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ২০১৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন করেন। (সূত্র: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, সমকাল ও নিরীক্ষা: ২২২তম সংখ্যা)

দেশে দক্ষ সাংবাদিক তৈরি হচ্ছে না: জাফর ওয়াজেদ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেছেন, গত ২০ বছরে বহু সংবাদমাধ্যম তৈরি হয়েছে; কিন্তু দেশে সেভাবে দক্ষ সাংবাদিক তৈরি হচ্ছে না।

১ এপ্রিল রাজধানীর কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলার অডিটোরিয়ামে নতুন অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'ভয়েজ বিডি ডট নিউজ'-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রিন্সিপাল গ্রুপের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জহিরুল ইসলাম ভয়েজ বিডি ডট নিউজের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্রাভিনেতা মামুনুন হাসান ইমন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য জাফর ওয়াজেদ বলেন, 'ভয়েজ বিডি ডট নিউজ অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। নতুন প্রতিষ্ঠানের যাত্রা একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার মতোই আনন্দের। তবে বর্তমানে সংবাদমাধ্যমে অনেক বেশি তথ্যের বিভ্রাট হচ্ছে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। আমাদের নাগরিকদের সচেতন হতে হবে। মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম হলো তথ্যের অধিকার। জনগণ সরকারকে কর দিচ্ছে, জনগণের অধিকার আছে সরকারের এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জবাবদিহিতা চাওয়ার।

ভয়েজ বিডির প্রতি শুভকামনা জানিয়ে জাফর ওয়াজেদ বলেন, 'অন্যান্য শিল্পগ্রুপের মতো প্রিন্সিপাল গ্রুপ ভয়েজ বিডি ডট নিউজ অনলাইনকে যেন করপোরেট বিজনেসের সঙ্গে মিশিয়ে না ফেলা হয়। অনলাইন সংবাদমাধ্যম পরিচালনা করা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের। তাই ভয়েজ বিডি সেদিক লক্ষ রেখে চলবে। আশা করছি, ভয়েজ বিডি বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার সঙ্গে পরিচালিত হবে। ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন শুধু সংবাদমাধ্যমের জন্য তৈরি হয়নি। ফেসবুক ও অনলাইনে গুজব সংবাদ প্রসারের কারণেই তৈরি হয়েছে।' ভয়েজ বিডি ডট নিউজের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. একেএম ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে আরও উপস্থিত ছিলেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব কারি হাবিবুল্লাহ বেলালী, ভয়েজ বিডি ডট নিউজের প্রকাশক কাজী শরীফ উল্লাহ, ভয়েজ বিডি ডট নিউজের উপসম্পাদক মো. শিবলী নোমান সরকার প্রমুখ।

অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'ভয়েজ বিডি ডট নিউজ' এর আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

শোক সংবাদ

আবদুল ওয়াসে আনসারী

বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য আবদুল ওয়াসে আনসারী (৭৬) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ১২ ডিসেম্বর দুপুরে লালমাটিয়ার নিজ বাসায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। ওইদিন বাদ মাগরিব জাতীয় প্রেস ক্লাবে জানাজা শেষে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে ওয়াসে আনসারীর মরদেহ দাফন করা হয়।

ওয়াসে আনসারী দৈনিক বাংলা, আজকের কাগজ ও নয়া দিগন্তে জ্যেষ্ঠ ফটোসাংবাদিক হিসাবে কাজ করেছেন।

মিয়া আব্দুস সাত্তার

শত্রুমুক্ত বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র দৈনিক স্ফুলিঙ্গের সম্পাদক মিয়া আব্দুস সাত্তার (৮৪) ২৩ ডিসেম্বর যশোরের নতুন উপশহরের বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

নতুন উপশহর মারকাজ মসজিদে জানাজা শেষে শেষবারের মতো যশোর প্রেস ক্লাবে নিয়ে আসা হয়। এর আগে সাংবাদিকরা কালোব্যাজ ধারণ করেন। বিকালে শহরের ঘোপ কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন সম্পন্ন হয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মিয়া আব্দুস সাত্তারের সম্পাদনায় শত্রুমুক্ত যশোর থেকে ১৯৭১-এর ৯ ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'স্ফুলিঙ্গ'। এটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পত্রিকা। যশোর শত্রুমুক্ত হওয়ার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশিত সাপ্তাহিক স্ফুলিঙ্গ ১৯৭৬ সালে দৈনিকে রূপ নেয়। মিয়া আব্দুস সাত্তার ১৯৩৮ সালের ৪ এপ্রিল ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার সোনাতুন্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

আবদুর রহমান খান

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি, যুগ্মসম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও রেডিয়ো তেহরান বাংলাদেশের ব্যুরোপ্রধান আবদুর রহমান খান (৭০) আর নেই। তিনি লিভারের জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ২৭ ডিসেম্বর রাতে ইবনে সিনা হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ২৮ ডিসেম্বর বাদ জোহর জাতীয় প্রেস ক্লাবে জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। আবদুর রহমান খান বাংলাদেশ টাইমস, দ্য মর্নিং সান, ডেইলি ইনডিপেনডেন্ট, ডেইলি টেলিগ্রাফ ও সাপ্তাহিক হলিডেতে কাজ করেছেন।

বিপ্লব জামান

রাজধানীর পল্লবীতে বিপ্লব জামান (৬০) নামে এক সাংবাদিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ২১ জানুয়ারি বিকালে পল্লবীর সাংবাদিক কলোনির একটি ভবনের পঞ্চম তলা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। বিপ্লব দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বার্তাবিষয়ক পরামর্শক ছিলেন।

ওই পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক এনামুল হক জানান, বিপ্লব জামান তাঁর পাশের ডেস্কে কাজ করতেন। এক সপ্তাহ ধরে তিনি অফিসে অনুপস্থিত। ২০ জানুয়ারি বিপ্লবের বাসার মালিকের ফোনে কল দিয়ে তাঁর বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন এনামুল। কিন্তু কোনো খোঁজ পাননি। বিপ্লবের মরদেহ উদ্ধারের খবর পায় অফিসের লোকজন। বাসায় একাই থাকতেন তিনি।

পল্লবী থানার ওসি পারভেজ ইসলাম জানান, বিপ্লবের বাসা থেকে ২১ জানুয়ারি দুর্গন্ধ বের হয়। এর উৎস সন্ধানে বাসাটির দরজায় ধাক্কা দেন অন্য ভাড়াটিয়ারা। কিন্তু সাড়া পাওয়া যায়নি। ভেতর থেকে আটকানো ছিল। পরে পাশের বাসার ছাদ থেকে একজন উঁকি দিয়ে দেখেন বারান্দায় উপুড় হয়ে আছেন বিপ্লব। পরে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

ওসি আরও জানান, মরদেহ পচে গেছে। তবে শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছেন।

এমএ মোতালেব

কালের কণ্ঠের বাগেরহাটের মোংলা প্রতিনিধি এবং মোংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি এমএ মোতালেব (৬৩) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ৭ জানুয়ারি রাজধানীর বনশ্রী এলাকায় তাঁর বড়ো মেয়ের বাসায় বেড়াতে গেলে সেখানে তিনি মারা যান। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন।

মোতালেব মোংলা পৌর শহরের বাতেন সড়কের বাসিন্দা ছিলেন। মোংলায় জোহরের পর জানাজা শেষে পৌর কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

মাইন উদ্দিন আহমেদ

ডেইলি এশিয়ান এজের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ (৬৯) আর নেই। ১ জানুয়ারি রাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মেডিকেল সেন্টার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

নিউইয়র্কে ওজন পার্কের বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি কিডনি সমস্যাসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন।

মাইন উদ্দিন আহমেদের পৈতৃক নিবাস নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলা ভীমপুর গ্রামে। পেশাগত জীবনে ডেইলি নিউ নেশন, বাংলাদেশ অবজারভার ও ডেইলি ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় কাজ করেছেন। তিনি নিয়মিত কবিতা ও ছড়া লিখতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হলো: 'পদভারে জাগ্রত সিঁড়ি', 'গোমর ওইলো হাক', 'অন্যত্র চলো', 'পরাবাস্তবতা এবং কবিতার সিঁড়ি' প্রভৃতি।

আনোয়ারুল হক

দৈনিক ইনকিলাবের নোয়াখালী ব্যুরোপ্রধান আনোয়ারুল হক (৬২) ১৬ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। নিজ কার্যালয়ে যাওয়ার পথে অসুস্থ হলে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আনোয়ারুল হকের জানাজা ও দাফন ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

মানিক সরকার

রংপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক যুগ্মসম্পাদক, ছড়াকার ও সাংবাদিক মানিক সরকার (৫৮) আর নেই। ৩ জানুয়ারি ভোরে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁর মরদেহ রংপুর প্রেস ক্লাব চত্বরে রাখা হয়। পরে শহরের দখিগঞ্জ শ্মশানে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মানিক সরকার ২০০৯ সালের আগস্টে কালের কণ্ঠ পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টার এবং রংপুর অফিসপ্রধান হিসাবে যোগ দিয়ে ২০১২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত কাজ করেন।

আবদুল কাদের মিয়া

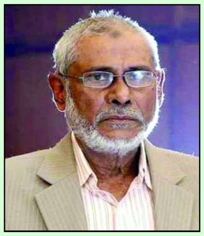

দৈনিক সংগ্রামের বার্তা সম্পাদক একেএম আবদুল কাদের মিয়া (৮১) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে ২৩ মার্চ রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। দৈনিক সংগ্রাম কার্যালয় প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ খুলনার খালিশপুর থানার বয়রায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়। কাদের মিয়া জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ছিলেন।

আনিসুর রহিম

সাতক্ষীরা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহিম (৭০) ৩ জানুয়ারি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। সাতক্ষীরা প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর বেলা ১১টায় শহরের শহিদ আবদুর রাজ্জাক পার্কে জানাজা শেষে কামালনগর কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

পাপ্পু মজুমদার

নেত্রকোনার বারাহাট্টায় মোহনগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী মহুয়া কমিউটার ট্রেনের ধাক্কায় নেত্রকোনার '৭১ বাংলা টিভি অনলাইনের প্রতিনিধি পাপ্পু মজুমদার (৩৫) নিহত হয়েছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকালে বারহাট্টা উপজেলার ইস্পিঞ্জাপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত পাপ্পু মজুমদার নেত্রকোনা জেলা শহরের অজহর রোডের স্বপন মজুমদারের ছেলে।

এলাকাবাসী ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, সাংবাদিক পাপ্পু মজুমদার ১৫ ফেব্রুয়ারি মোটরসাইকেলে শিশুসন্তানকে নিয়ে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে স্ত্রীর কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। বিকাল সাড়ে ৪টায় ময়মনসিংহ-মোহনগঞ্জ রেলপথের ইস্পিঞ্জাপুরে মোটরসাইকেল থামিয়ে শিশুসন্তানকে একটি দোকানে বসিয়ে রেখে রেললাইনের পাশে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যান। পরে মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে রেললাইনের পাশ দিয়ে সন্তানের কাছে ফিরছিলেন। এ সময় মোহনগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা দ্রুতগামী মহুয়া কমিউটার ট্রেন তাকে ধাক্কা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই তাঁর মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

মোজাহিদুল ইসলাম রাজু

জয়পুরহাট আদালতের আইনজীবী, জয়পুরহাট জেলা ও কালাই প্রেস ক্লাবের সদস্য মোজাহিদুল ইসলাম রাজু (৪৮) ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর বগুড়ার একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ৩১ ডিসেম্বর জানাজা শেষে গ্রামের বাড়ি উলিপুরে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

শারমিন শবনম

রাজধানীর হাতিরঝিলের বাসা থেকে সাংবাদিক শারমিন শবনমের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা করেছে পরিবার। শবনমের বড়ো বোন বাদী হয়ে এই মামলা করেন। মামলায় শবনমের স্বামী এশিয়ান টিভির সাবেক অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদক সাইদুল ইসলামকে আসামি করা হয়েছে। হাতিরঝিল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মেজবাহ উদ্দীন বলেন, গত ২৭ ডিসেম্বর বিকাল ৫টার দিকে বাসার দরজা ভেঙে সাংবাদিক শারমিন শবনমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ওই সময় বাসায় কাউকে পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, শবনম 'দ্য রিপোর্ট ডট লাইভ' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সংবাদকর্মী ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ঝিনাইদহ সদর উপজেলায়। বাবার নাম হারুন অর রশিদ। গত বছর মার্চে স্বামী সাইদুল ইসলামের সঙ্গে ওই বাসা ভাড়া নেন তারা। সাইদুলের বাড়ি চাঁদপুর।

আশিকুর রহমান আশিক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পূর্ববিরোধের জেরে আশিকুর রহমান আশিক নামে এক সাংবাদিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ৯ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের অবকাশ পার্কের পাশে এ ঘটনা ঘটে। আশিকের বাড়ি পৌর এলাকার মেড্ডা গ্রামে। তিনি দৈনিক পর্যবেক্ষণ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি ছিলেন। এছাড়া বাতিঘর নামে সেবামূলক সংগঠনের কর্মী ছিলেন তিনি।

সাংবাদিকতায় আসার আগে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন আশিক। প্রত্যক্ষদর্শী প্রকৌশলী আজহার উদ্দিন জানান, অবকাশ ফারুকী পার্কে বিকাল সাড়ে ৩টায় বাতিঘরের সভা সংগঠনের সদস্য আশিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে পার্ক থেকে বের হয়ে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় উঠলে ৫-৬ তরুণ ঘেরাও করে তাঁর বুকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে। তারা পালানোর সময় আহত আশিকসহ সংগঠনের কয়েকজন ধাওয়া করেন। তিনি বলেন, আশিককে ছুরিকাঘাত করেছে রায়হান। তাদের পেছনে দৌড়ানোর একপর্যায়ে তিনি অচেতন হয়ে রাস্তায় পড়ে যান। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সেতারা মূসা

সাংবাদিক সেতারা মূসা (৮৩) ১৪ মার্চ রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। তিনি ফুসফুসের জটিলতায় ভুগছিলেন।

সেতারা মূসা ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভারের সম্পাদক প্রয়াত আবদুস সালামের মেয়ে এবং প্রয়াত সাংবাদিক এবি এম মূসার স্ত্রী।

সেতারা মূসার জন্ম ১৯৪০ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর করেন। দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক জনতা, দৈনিক আওয়াজসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন সেতারা মূসা। রেড ক্রিসেন্ট, পরিবার পরিকল্পনা সমিতিসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

১৪ মার্চ বাদ এশা মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোডের মসজিদে সেতারা মূসার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ মার্চ ফেনীর কুতুবপুর গ্রামে স্বামী এবি এম মূসার কবরের পাশে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

বারবারা ওয়াল্টারস

যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত টিভি সাংবাদিক ও উপস্থাপক বারবারা ওয়াল্টারস মারা গেছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজ তাঁর মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছে। ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ নিউইয়র্কের নিজ বাড়িতে মারা যান ৯৩ বছর বয়সি বারবারা ওয়াল্টারস।

১৯২৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে জন্মগ্রহণ করেন প্রখ্যাত এ সাংবাদিক। ১৯৬১ সালে এবিসি নিউজে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। এরপর ১৯৭৪ সালে এনবিসির একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী সহ-উপস্থাপক হিসাবে নাম লেখান। পরে ১৯৭৬ সালে এবিসি নিউজে সংবাদ উপস্থাপক হিসাবে যোগদান করেন। সাংবাদিকতার জীবনে ১২ বার অ্যামি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছিলেন বারবারা ওয়াল্টারস।

পিআইবি'র কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকারবিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

পিআইবির কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকারবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে পিআইবির কর্মকর্তাদের জন্য সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিকার বিষয়ে ২৬ ডিসেম্বর একদিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. নজরুল ইসলাম তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সম্যক ধারণা ও করণীয় শীর্ষক আলোচনা করেন। কীভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় ও এর প্রয়োগ করা যায়, সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সমাজ কিংবা প্রশাসনে সুশাসন কেবল জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্ভব। অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা তথ্য দিতে অনেক সময় দ্বিধা করেন। তারা তথ্য দিতে অনেক সময় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশনার ওপর নির্ভর করেন। এসব বিবেচনায় তথ্য কর্মকর্তা নিজের কাছে তথ্য থাকলে ২০ কার্যদিবস, অন্যের কাছ থেকে নিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য দেবেন। জাফর ওয়াজেদ বলেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা তথ্য না দিলে সেক্ষেত্রে জরিমানার বিধান রয়েছে। পিআইবির উপপরিচালক (প্রশাসন) মো. জাকির হোসেনের সমন্বয়ে পিআইবির ২৯ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবির কর্মচারীদের ক্রয়পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ১৫ ডিসেম্বর পিআইবির ১১-১৬তম গ্রেডের কর্মচারীদের সরকারি মালামাল ক্রয়সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পিআইবির সেমিনার

পিআইবি'র কর্মচারীদের ক্রয়পদ্ধতিবিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে মডারেটর হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। তিনি সরকারি মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে কী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় এবং কীভাবে ক্রয় করলে সরকারি অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেন। জাফর ওয়াজেদ আধুনিক দরপত্র এবং আগের দরপত্রের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করেন। বর্তমান ডিজিটাল পদ্ধতিতে ইজিপির মাধ্যমে সহজে এবং মান ঠিক রেখে কীভাবে মালামাল ক্রয় করা যায়, সেই সম্পর্কেও আলোচনা করেন। পিআইবির মহাপরিচালক বলেন, একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়, যখন সে দেশের সরকারি মালামাল ক্রয়ে স্বচ্ছতা থাকে এবং গুণগত মান ঠিক থাকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিআইবির উপপরিচালক (প্রশাসন) মো. জাকির হোসেন।

ডিআরইউ সদস্যদের অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্যদের নিয়ে দুইদিনব্যাপী (১৯-২০ ডিসেম্বর) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সভাপতি মুরসালিন নোমানী বলেন, অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি করে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা যায়। ডিআরইউ সভাপতি বলেন, ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং এমন একটি বিষয়, যা সমাজের অনাচার দূর করতে অনেকটা সহায়তা করে। মুরসালিন নোমানী আরও বলেন, সাংবাদিকরা জনগণের জন্য তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি করেন। ফলে জনগণ দেশ ও পৃথিবীর সব খবর মুহূর্তে নিজের করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়। বিশেষ অতিথি ডিআরইউ-এর সাধারণ সম্পাদক মাঈনুল হোসেন সোহেল বলেন, বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে সাংবাদিকতা করার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো প্রশিক্ষণ। কারণ, প্রশিক্ষিত প্রতিবেদক ছাড়া বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও সাবলীল প্রতিবেদন প্রায় অসম্ভব। পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, বর্তমান যুগ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন হচ্ছে। এর সঙ্গে টিকে থাকতে হলে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষিত হতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই বলে মতপ্রকাশ করেন তিনি। পিআইবির মহাপরিচালক আরও বলেন, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশে সরকারি অর্থায়নে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে তিনি ডেটা, ড্রোন ও রোবোটিকসের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি পাঠক, দর্শক ও শ্রোতার কথা মাথায় রেখে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উৎকর্ষতা নিয়ে কথা বলেন। পিআইবির প্রশিক্ষক মো. শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটলেও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেনি

–প্রধান তথ্য কর্মকর্তা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে পিআইবির সেমিনার কক্ষে দুইদিনব্যাপী (২৬-২৭ ডিসেম্বর) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মো. শাহেনুর মিয়া। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটলেও এখনো আমাদের মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেনি। আমরা অহেতুক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মেতে থাকি। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা বলেন, যতদিন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হবে না, ততদিন আমরা উন্নত জাতিতে পরিণত হতে পারব না। তবে এর জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মো.

ডিআরইউ সদস্যদের অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ ও ডিআরইউ-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মো. শাহেনুর মিয়া ও পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

শাহেনুর মিয়া আরও বলেন, অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি করে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা যায়। তাছাড়া ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং এমন একটি বিষয়, যা সমাজের অনাচার দূর করতে অনেকটা সহায়তা করে। অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, বর্তমান যুগ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন হচ্ছে। এর সঙ্গে টিকে থাকতে হলে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষিত হতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই বলে মতপ্রকাশ করেন তিনি। তিনি পাঠক, দর্শক ও শ্রোতার কথা মাথায় রেখে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উৎকর্ষতা নিয়ে কথা বলেন। পিআইবির প্রশিক্ষক মো. শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বানাসাসের সাংবাদিকদের মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক সমিতির (বানাসাস) সাংবাদিকদের নিয়ে দুইদিনব্যাপী (২৮-২৯ ডিসেম্বর) মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মুহ. সাইফুল্লাহ। তিনি বলেন, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মোবাইল সাংবাদিকতার ব্যাপ্তি বেড়েছে। মোবাইল সাংবাদিকতার সহায়তায় প্রতিবেদক সহজে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। তিনি মোবাইল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অডিয়ো, ভিডিয়ো এবং ভিজুয়ালের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের তাগিদ দেন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ মোবাইল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ডিভাইস ব্যবহার করে কীভাবে পেশাগত মানোন্নয়ন করা যায়, এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি মোবাইলে ফুটেজ নেওয়া, অডিয়ো ধারণ এবং সেগুলোর ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। মোবাইলে ভিডিয়ো শট নেওয়ার ক্ষেত্রে ওয়াইড ও লং শট, ফেস শট, ক্লোজ বা হাতের অবস্থান, সাক্ষাৎকারসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন। তিনি মোবাইল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ছবি, ব্যানার, অক্ষর প্রভৃতি ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেন। পিআইবির প্রশিক্ষক পারভীন সুলতানা রাব্বীর সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক সমিতির (বানাসাস) ৩৫জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

খাগড়াছড়ি জেলার সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে খাগড়াছড়ি জেলার সাংবাদিকদের জন্য খাগড়াছড়ি প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে দুইদিনব্যাপী (২৮-২৯ ডিসেম্বর) ফ্যাক্ট চেক বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুইপ্রু চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন পিআইবির উপপরিচালক মো. জাকির হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন খাগড়াছড়ি প্রেস ক্লাবের সভাপতি জিতেন বড়ুয়া।

বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক সমিতির সদস্যদের মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মুহ. সাইফুল্লাহ ও পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

খাগড়াছড়ি জেলার সাংবাদিকদের জন্য ফ্যাক্টচেক বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুইপ্রু চৌধুরী

পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ইতিবাচক প্রতিবেদন আবশ্যক

–সায়েম খান

আওয়ামী লীগের উপদপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট সায়েম খান বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ইতিবাচক প্রতিবেদন আবশ্যক। পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের দুইদিনব্যাপী (১৭-১৮ জানুয়ারি) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান অতিথি হিসাবে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। সায়েম খান বলেন, প্রযুক্তির বিবর্তনের কারণে দেশের অগ্রগতিসাধনে সাংবাদিকদের জ্ঞান আহরণের কোনো বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের মানুষের কাছে বার্তাবাহক হিসাবে কাজ করেন। সেজন্য বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন জরুরি। তথ্যের অবাধ প্রবাহ যেন সাংবাদিকতায় নতুন নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা একজন প্রতিভাবান সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের এই উপ-দপ্তর সম্পাদক।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, সাংবাদিকতায় নীতি-নৈতিকতা অন্যতম অনুষঙ্গ। কারণ, পাঠক ও শ্রোতার গুরুত্ব বুঝে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতার প্রয়োগ ঘটাতে হয়। তিনি আরও বলেন, প্রতিবেদন তৈরিতে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। সাংবাদিকের দায়িত্ব তথ্য দেওয়া, মতামত প্রদান নয়। জাফর ওয়াজেদ বলেন, গণমাধ্যমের সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম হলো চলচ্চিত্র। এছাড়া স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা অগ্রগণ্য বলে মন্তব্য করেন তিনি। পিআইবির সিনিয়র প্রশিক্ষক শেখ মজলিশ ফুয়াদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের সদস্যদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট সায়েম খান ও পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

স্মার্ট বাংলাদেশের বাস্তব প্রতিফলন মোবাইল সাংবাদিকতা

–রেজা সেলিম

আমাদের গ্রাম প্রকল্পের পরিচালক রেজা সেলিম বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের বাস্তব প্রতিফলন হলো মোবাইল সাংবাদিকতা। কারণ, সেকেলে সাংবাদিকতার অনুষঙ্গ ছেড়ে আধুনিক স্মার্ট অনুষঙ্গ মোবাইলের মাধ্যমে সাংবাদিকতার ব্যাপ্তি বেড়েছে। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে মোংলায় বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের দুইদিনব্যাপী (১৯-২০ জানুয়ারি) মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। প্রধান অতিথি আগামী প্রজন্মের জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে জনশক্তিকে দক্ষ হিসাবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। রেজা সেলিম বলেন, সাংবাদিকদের জানার পরিধি যত বৃদ্ধি পাবে, তত সাবলীল প্রতিবেদন পাবে পাঠক ও শ্রোতা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মোংলা পোর্ট পৌরসভার মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আব্দুর রহমান।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ মোবাইল সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিগন্ত নিয়ে আলোচনা করেন। মোবাইলের মাধ্যমে কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করা যায়, সহজে সেসব কলাকৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। পিআইবির মহাপরিচালক মোবাইল সাংবাদিকতার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের সারথি হওয়ার বিষয়টি আলোকপাত করেন। পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

উপস্থিত ছিলেন মোংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুল ইসলাম।

বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আমাদের গ্রাম প্রকল্পের পরিচালক রেজা সেলিমকে পিআইবি প্রকাশিত বই উপহার দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

মোংলা বন্দর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চারণভূমি

–মোংলা উপজেলা চেয়ারম্যান

মোংলা সমুদ্রবন্দরকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চারণভূমি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন মোংলা উপজেলা চেয়ারম্যান আবু তাহের হাওলাদার। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে বাগেরহাটের মোংলায় বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের দুইদিনব্যাপী (২১-২২ জানুয়ারি) অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটলেও মোংলা এলাকায় এখনো এর বিকাশ ঘটেনি। এখানে তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশ ঘটাতে পারলে প্রতিবেদন তৈরি করতে কোনো বেগ পেতে হবে না। এমনকি সমুদ্রবন্দর, সুন্দরবন, লবণ ও চিংড়িচাষিসহ অসংখ্য প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে সহজে। উপজেলা চেয়ারম্যান বলেন, যতদিন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হবে, ততদিন আমরা উন্নত জাতিতে পরিণত হতে পারব না। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোংলা সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসিফ ইকবাল বলেন, ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং এমন একটি বিষয়, যা সমাজের অনাচার দূর করতে অনেকটা সহায়তা করে।

অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, বর্তমান যুগ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন হচ্ছে। এর সঙ্গে টিকে থাকতে হলে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষিত হতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই বলে মতপ্রকাশ করেন তিনি। পিআইবির মহাপরিচালক বলেন, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশে সরকারি অর্থায়নে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে ডেটা, ড্রোন ও রোবোটিকসের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেন তিনি। এছাড়া পাঠক, দর্শক ও শ্রোতার কথা মাথায় রেখে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উৎকর্ষতা নিয়ে কথা বলেন তিনি।

পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিনের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে আরও

পিআইবিতে নোয়াখালীর সাংবাদিকদের অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

সৃজনশীলতা ও নিজস্ব স্বকীয়তাই সাংবাদিকের প্রথম পরিচয় বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) বার্তা সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া। পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের দুইদিনব্যাপী (২৫-২৬ জানুয়ারি) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান অতিথি হিসাবে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। আইয়ুব ভূঁইয়া বলেন, সাংবাদিকতা করতে হলে তাকে ন্যূনতম সাধারণ বোধোদয় ও ধৈর্য সহকারে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। নতুবা বস্তুনিষ্ঠ ও সাবলীল প্রতিবেদন করা সম্ভব না। তিনি আরও বলেন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ যেন সাংবাদিকতায় নতুন নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা একজন প্রতিভাবান সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্ব।

অনুষ্ঠানে সভাপ্রধান পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরিতে একজন সাংবাদিকের সাধারণ বোধ, জ্ঞানের পরিধি, সাহস ও ধৈর্য থাকা অপরিহার্য। নতুবা অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হয়

বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন মোংলা উপজেলা চেয়ারম্যান আবু তাহের হাওলাদার ও পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ শেষে ফটোসেশন

না। তিনি আরও বলেন, অনুসন্ধান প্রতিবেদন সময়সাপেক্ষ বিষয়। সেদিকে লক্ষ রেখে কাজ করতে হবে। জাফর ওয়াজেদ বলেন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন একধরনের গবেষণা প্রতিবেদন। কারণ, পুরোনো তথ্য উদ্‌ঘাটন করে সত্য বিষয়টি জানাতে রীতিমতো গবেষণা করার প্রয়োজন হয়। নতুবা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এছাড়া স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা অগ্রগণ্য বলে মন্তব্য করেন পিআইবির মহাপরিচালক। পিআইবির কনিষ্ঠ প্রশিক্ষক মো. শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরিতে একজন সাংবাদিকের জ্ঞানের পরিধি, সাহস ও ধৈর্য থাকা অপরিহার্য। নইলে অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি অসম্ভব হয়। তিনি আরও বলেন, অনুসন্ধান প্রতিবেদন তৈরির জন্য সময়কে গুরুত্ব দিতে হয়। পিআইবির কনিষ্ঠ প্রশিক্ষক মো. শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

সমাজ পরিবর্তনে সাংবাদিকের ভূমিকা অগ্রগণ্য

–তথ্য ও সম্প্রচার সচিব

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার বলেছেন, সমাজ পরিবর্তনে সাংবাদিকের ভূমিকা অগ্রগণ্য। সাংবাদিকরাই পারেন সমাজের চিত্র পরিবর্তন করতে। তবে আমাদের সমাজ বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালি ঐতিহ্য ছাড়া সম্ভব নয়। পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের দুইদিনব্যাপী (৭-৮ ফেব্রুয়ারি) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান অতিথি হিসাবে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার বলেন, একটি অনগ্রসর সমাজকে উন্নয়নের ধারায় ধাবিত করতে সাংবাদিকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে স্মার্ট নাগরিক হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য নাগরিকদের স্মার্ট হতে হবে। নতুবা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে। তথ্যপ্রযুক্তিসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে নিজেকে দক্ষ করে তুলতে পারলেই কেবল স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট নাগরিকের সুবিধা পাওয়া যাবে। নতুবা সমসাময়িকদের থেকে সবদিক দিয়ে পিছিয়ে থাকতে হবে। তথ্যসচিব আরও বলেন, সাংবাদিক সমাজের দূত হিসাবে কাজ করেন। সেদিকে লক্ষ রেখে অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরিতে গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলে সমাজের অনাচার প্রকাশ পাবে।

প্রযুক্তির বিবর্তনে অর্থ ও বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এসেছে

–ড. গোলাম রহমান

দৈনিক আজকের পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান বলেছেন, প্রযুক্তির বিবর্তনে অর্থ ও বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। একমাত্র সাংবাদিকই পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরতে পারেন সমাজের কাছে। পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সদস্যদের দুইদিনব্যাপী (২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি) অর্থনীতি ও বাণিজ্যবিষয়ক সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান অতিথি হিসাবে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সদস্যদের জন্য অর্থনীতি ও বাণিজ্যবিষয়ক সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ শেষে প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান ও পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজাদের সঙ্গে সনদপ্রাপ্তদের ফটোসেশন

আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পাশাপাশি পঞ্চম প্রজন্মের কৃত্রিম বুদ্ধির চ্যাটজিপিটির ওপর গুরুত্বারোপ করেন অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান। প্রধান অতিথি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনীতি প্রবৃদ্ধিসহ নানা বিষয়ে ব্যাপ্তি বেড়েছে। দেশে আগের চেয়ে অগ্রগতি হওয়ায় বাণিজ্য ও অর্থনীতিবিষয়ক তথ্য ও সংবাদের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মন্তব্য করেন ড. গোলাম রহমান। তিনি আরও বলেন, বৈশ্বিক বৈচিত্র্যের কারণে অর্থনীতির ধারণা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। এর সঙ্গে তালমিলিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে হলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের কোনো বিকল্প নেই। এজন্য সবচেয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে অর্থনীতি ও বাণিজ্যবিষয়ক সাংবাদিকতায় কাজ করা কর্মীদের।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, অর্থনীতি ও বাণিজ্য প্রতিবেদন তৈরিতে একজন সাংবাদিককে জ্ঞানের পরিধি, অনুসন্ধানী মননের অধিকারী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নইলে সঠিক তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি অসম্ভব হয়। তিনি আরও বলেন, অর্থনীতি ও বাণিজ্য প্রতিবেদন তৈরির জন্য সময়কে গুরুত্ব দিতে হয়। কারণ, অর্থনীতি ও বাণিজ্য প্রতিবেদন একধরনের গবেষণা প্রতিবেদন। জাফর ওয়াজেদ বলেন, পুরোনো তথ্য ও নতুন তথ্যের সমন্বয়ে বিষয়টি প্রকাশে রীতিমতো গবেষণা করার প্রয়োজন হয়। নতুবা অর্থনীতি ও বাণিজ্য প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শেখ মজলিশ ফুয়াদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অতিথি হিসাবে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মীরধা ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম উপস্থিত ছিলেন।

খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতে সচেতনতা জরুরি

–জাফর ওয়াজেদ

খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতে সচেতনতা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে ১৬ মার্চ CODEX Alimentarius and Food Safety এবং খাদ্যনিরাপত্তার ওপর মিডিয়া সংবেদনশীলতা শীর্ষক এক কর্মশালায় এসব কথা বলেন তিনি। বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ এবং মিটিং দ্য আন্ডারনিউটেশন চ্যালেঞ্জ (এমইউসিএইচ) প্রজেক্ট, এফএও (MUCH) প্রকল্পের সহযোগিতার প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এই কর্মশালার আয়োজনে করে। পিআইবির মহাপরিচালক বলেন, নিরাপদ খাদ্য গ্রহণে জনগণকে সচেতন করতে গণমাধ্যমকর্মীদের বেশি সচেতনতামূলক বার্তা প্রচারে গুরুত্ব দিতে হবে। খাবার গ্রহণ, সংরক্ষণ, পুষ্টিগুণ বজায় রেখে কীভাবে নিরাপদ থাকবে–এসব সম্পর্কে জানাতে হবে। কর্মশালায় জাফর ওয়াজেদ বলেন, খাদ্যের মান ও নিরাপত্তা নিয়ে যেসব কর্তৃপক্ষ কাজ করছে, তাদের মধ্যেও সমন্বয় থাকতে হবে। পাশাপাশি নিরাপদ খাবারের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা রয়েছে, তাদের সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে। আরও বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে, যার মাধ্যমে জনগণ সুস্বাস্থ্য নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. মঞ্জুর মোরশেদ আহমেদ বলেন, সুস্থ-সবল জাতি গঠনে খাদ্যের নিরাপত্তা ও পুষ্টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রের সব নাগরিকের জন্য খাদ্যের মৌলিক

খাদ্যনিরাপত্তার ওপর মিডিয়ার সংবেদনশীলতা শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

চাহিদা পূরণ আবশ্যক। খাদ্য ক্রয়, রান্না, পরিবেশন ও সংরক্ষণের প্রতিটি ধাপে খাদ্য কীভাবে নিরাপদ রাখা যায়–এসব বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কাজ করছে।

কর্মশালায় তথ্য উপস্থাপন করেন অপুষ্টি চ্যালেঞ্জ (MUCH) প্রকল্পের জাতীয় নিরাপদ খাদ্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন। তিনি বলেন, কোডে অ্যালিমেন্টারিউস বা 'খাদ্য কোড' আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত খাদ্য মানগুলোর একটি নির্দেশনা। এই মানগুলো ভোক্তাদের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং খাদ্য বাণিজ্যে উপযুক্ত মান নিশ্চিত করে। পিআইবির প্রশিক্ষক পারভীন সুলতানা রাব্বীর সমন্বয়ে কর্মশালায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৪০ জন সংবাদকর্মী অংশ নেন।

পিআইবির কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণ

পিআইবি'র কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচারবিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচারবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে পিআইবির সেমিনার কক্ষে (২৯ মার্চ) এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে জাফর ওয়াজেদ জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা ও করণীয় শীর্ষক বিভিন্ন বিষয় আলোকপাত করেন। কীভাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করা যায়, সেটা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। জাফর ওয়াজেদ বলেন, দাপ্তরিক কাজকর্ম সঠিকভাবে পালন করা হলো শুদ্ধাচারের অন্যতম ভিত্তি। এই ভিত্তি যত মজবুত হবে, আমরা জাতীয় জীবনে ততটা অগ্রসর হতে পারব।

প্রশিক্ষণের রিসোর্সপারসন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রেস) মো. কাউসার আহাম্মদ শুদ্ধাচার কী, শুদ্ধাচার কখন থেকে শুরু, বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে কত আগে এটা চালু হয়েছে, এর ওপর বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বাংলাদেশে এই শুদ্ধাচার শুরুর বছর ২০১২ মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, জাপান এটা শুরু করেছে ১৯৯২ সাল থেকে। এছাড়া কানাডা, ব্রাজিলসহ অন্যান্য দেশের শুদ্ধাচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা এবং তাদের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেন।

পিআইবির উপপরিচালক (প্রশাসন) মো. জাকির হোসেনের সমন্বয়ে পিআইবির ২৪ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ডেসকোর মুজিব কর্নারে পিআইবির বই উপহার

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো)-এর প্রধান কার্যালয়ের মুজিব কর্নারে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বই উপহার দেওয়া হয়েছে। পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ ডেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাওসার আমীর আলীর হাতে এসব বই তুলে দেন।

জাফর ওয়াজেদ বলেন, 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্ভুল বই প্রকাশের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে। বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রকাশিত হওয়ায় জাতি নানানরকমের বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে।'

এ সময় বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম, সংবাদপত্রের ইতিহাস নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন জাফর ওয়াজেদ। তুলে ধরেন করোনাকালীন সংকটে সারা দেশে ৮ হাজার সাংবাদিককে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া নগদ অর্থ সহায়তার বিষয়টিও। জাফর ওয়াজেদকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ডেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. কাওসার আমীর আলী।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ডেসকোর আওতাধীন গ্রাহকসেবার মানোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ

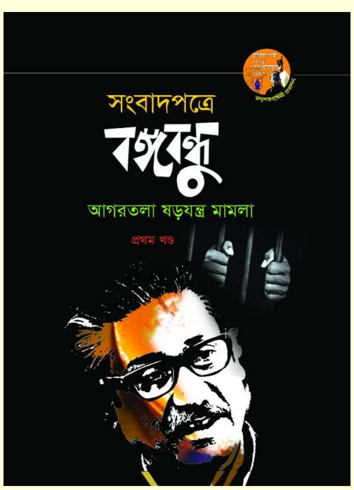

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

ডেসকোর প্রধান কার্যালয়ের মুজিব কর্নারে ডেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাওছার আমীর আলীর হাতে পিআইবি প্রকাশিত বই উপহার দেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

করে যাচ্ছি। ২২ জানুয়ারি প্রতিমন্ত্রী (নসরুল হামিদ) আমাদের স্ক্যাডা সিস্টেম উদ্‌বোধন করেছেন। এর মাধ্যমে আমরা প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পেরেছি।'

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বই উপহার পেয়ে ডেসকো পরিবারের পক্ষ থেকে তিনি পিআইবিকে ধন্যবাদ জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিআইবির সহকারী সম্পাদক দুলাল আচার্য, পিআইবির গবেষক এনায়েত হোসেন রেজা, ডেসকোর নির্বাহী পরিচালক সংগ্রহ একেএম মহিউদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) জাকির হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী এনামুল হক, প্রধান প্রকৌশলী শামীম আহসান চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক মো. মমিনুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আব্দুস সালাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক গাজী শাহরিয়ার পারভেজ, কোম্পানি সচিব মো. আতিকুর রহমান, ব্যবস্থাপক নুরুজ্জামান মোল্লা, ডেসকোর মিডিয়া ফেসিলিটেটর মলয় বিকাশ দেবনাথ প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্যদের জন্য মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করছেন মুন্সিগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মহিউদ্দিন ও পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রেস ক্লাব সদস্যদের মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ

মুন্সিগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন বলেছেন, বঙ্গবন্ধু বলতেন, সাংবাদিক শিক্ষিত হলে, সাধারণ মানুষও শিক্ষিত হয়। মুন্সিগঞ্জ সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্যদের জন্য দুইব্যাপী (১৬-১৭ জানুয়ারি) মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। মো. মহিউদ্দিন বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাংবাদিকবান্ধব নেতা। সাংবাদিকরা জাতির বিবেক আখ্যা দিয়ে দেশ গঠনে তাঁদের ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দেন। মো. মহিউদ্দিন বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সাংবাদিকদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ মোবাইল সাংবাদিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি মোবাইল সাংবাদিকতাকে ওয়ানম্যান আর্মি হিসাবে আখ্যা দেন। জাফর ওয়াজেদ মোবাইল সাংবাদিকতায় অডিয়ো, ভিডিয়ো, স্থির চিত্র নেওয়ার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। পিআইবির মহাপরিচালক আরও বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অগ্রযাত্রায় মোবাইল সাংবাদিকতা অন্যতম অনুষঙ্গ। পিআইবির প্রশিক্ষক পারভীন সুলতান রাব্বীর সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

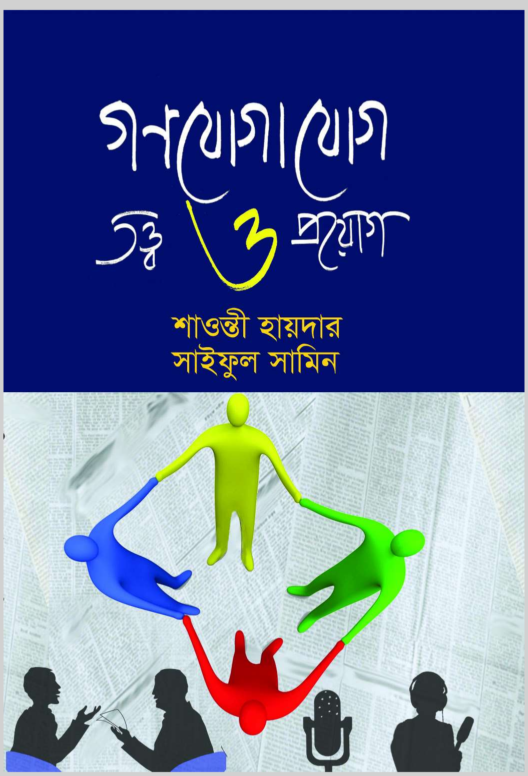

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা